২২ জানুয়ারি ১৯৮৬ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

আনন্দমেলা

অলিম্পিক কোচ জিম ও'ডোহার্টি বলেন:
"শক্তি আর স্ট্যামিনা গড়তে কমপ্ল্যান® অদ্বিতীয়!"

প্রখ্যাত অলিম্পিয়ান জিম ও'ডোহার্টি ভারতসমেত, সারা জগতেই প্রতিভাসম্পন্ন তরুণ খেলোয়াড়দের জোরদার কঠিন প্রতিযোগিতার জন্য ট্রেনিং দেন। তাঁর মতে চ্যাম্পিয়নরা মাটি ফুঁড়ে জন্মায় না, তাদের তৈরী করতে হয়। আর বিজয়ী হতে গেলে যেমন জোরালো ইচ্ছাশক্তির দরকার, তেমন-ই জোরালো দৈহিক শক্তিরও দরকার।

"সাঁতারু, অ্যাথলেট আর বিশেষ করে বাড়ন্ত বাচ্চাদের আমি নিয়মিত কমপ্লান দেয়ার পরামর্শ দিই" বলেন জিম ও' ডোহার্টি। "কমপ্লান হ'ল ২৩-টি প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ সম্পন্ন এক সম্পূর্ণ আহার, যা সুস্থ-সবল শরীর গড়ে ও স্ট্যামিনা বাড়ায় আর অতি সহজেই হজম হয়।"

অভিজ্ঞ জিম ও' ডোহার্টির মতামতটি আপনিও মানুন। আপনার বাচ্চাদেরও সর্বাঙ্গীন, সুস্থ-সবল বাড়ের জন্য প্রতি দিন কমপ্লান দিন। কমপ্লান পাওয়া যায় চমৎকার স্বাদ-গন্ধে, যা বাচ্চারা দারুণ ভালবাসে।

কমপ্লান®–সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

GLC.9- -Ben.R1

আনন্দমেলা

৮ মাঘ ১৩৯২ □ ২২ জানুয়ারি ১৯৮৬ □ ১১ বর্ষ ২১ সংখ্যা

গল্প

দেবনাথ কোথায় । প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ৪
জন্মদিনের দুঃখ । চৈতালী চট্টোপাধ্যায় ১১
খানসামা ও বিশে-ডাকাত । বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১৫
দুই বেচারা । প্রবাল দত্ত ২৫
টুয়ার জন্মদিন । কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায় ৫৫

সম্পূর্ণ উপন্যাস

রক্তাক্ত ওয়াটার্লু । বাণীব্রত চক্রবর্তী ৩৫

ছড়া

খড়্গনাসা সুবুদ্ধি । আনন্দ বাগচী ১৮

ভ্রমণকাহিনী

সুদূর লিবিয়ায় । অর্ণব দাঁ ৯

ধারাবাহিক উপন্যাস

গোলমাল । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৩২
শয়তানের চোখ । সমরেশ মজুমদার ৫১

শার্লক হোমসের গল্প

সিলভার ব্লেজ । সার আর্থার কোনার ডয়েল ২৮

বিজ্ঞানবিচিত্রা

ডাইনোসরের প্রবেশ-প্রস্থান । সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ২৬

লেখাপড়া

বশংবদ…নিঃসপত্ন…(অর্থ জানো) । দেব সেনাপতি ২৭
মধুরিমাদের বাড়িতে (সহজে ইংরেজি) । প্রসাদ ২৭

খেলাধুলো

শিল্ড গেল বাইরে । অশোক রায় ৬২
থার্টিওয়ান চিয়ার্স । মণীশ মৌলিক ৬৩
প্রথম টেস্ট ঝিমিয়ে গেল । সম্রাট রায় ৬৪
ঢাকায় বড়দিনের উপহার । রাজা গুপ্ত ৬৫
টেস্ট-ক্রিকেট ছাড়লেন জহির । নৃপতি চৌধুরী ৬৬

চিত্রকাহিনী ও কমিক্স

টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২২, টারজান ৩১
সদাশিব ৪৮, গাবলু ৫৭

অন্যান্য আকর্ষণ

ডাক্তারবাবু বলছেন ! (ডাঃ) বিশ্বনাথ রায় ১৭
তোমাদের পাতা ৪৯, ধাঁধা ৫৮, শব্দসন্ধান ৫৮
মজার খেলা ৫৯, হাসিখুশি ৫৯

প্রচ্ছদ : কৃষ্ণেন্দু চাকী

সম্পাদক : **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী**

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম তিন টাকা । বিমান মাশুল ত্রিপুরা ১০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

সব শিশুরই
এক সুর
গেঞ্জি পরুন
কোহিনুর

কোহিনুর নিটিং মিলস্
গেঞ্জি ● জাঙ্গিয়া
প্রস্তুতকারক
বাংলাদেশে আইনসম্মতভাবে বিক্রির জন্য প্রতি জেলায় ডিস্ট্রিবিউটার আবশ্যক ।
যোগাযোগ কেন্দ্র :
কোহিনুর নিটিং মিলস্
১১৩ মনোহর দাস কাটরা, কলিকাতা-৭০০০০৭

দেবনাথ কোথায় ?

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

ময়দানের কাছে বাস থেকে নেমেই মণীশ আর দেবনাথ দেখতে পেল, বেশ বড় লাইন হয়েছে। তাড়াতাড়ি এক ঠোঙা চিনেবাদাম কিনে ছুটতে-ছুটতে কিউয়ে দাঁড়াল তারা। যখন মাঠে ঢুকল, তখনও খেলা শুরু হতে মিনিট পাঁচেক বাকি। মণীশ বসেই বলল, "দেখেছিস, পশ্চিমের আকাশে মেঘটা কেমন জাঁকিয়ে বসেছে!" দেবনাথ বলল, "ওদিকে তাকাবি না। ওসব অলুক্ষুনে কথাও বলবি না।" এর মধ্যে বাঁশি বাজিয়ে খেলা শুরু হল।

হাফটাইমের পাঁচ মিনিট আগে মোহনবাগানের সেন্টার ফরওয়ার্ড বাইরের দলটির হাফব্যাকের কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়ে বারের তলা দিয়ে শুট করল। গোলকিপার এসে পৌঁছতে পারল না। মাঠে সবাই ছাতা খুলে সিটের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগল। মণীশের খুব ইচ্ছে হচ্ছিল পাশের ভদ্রলোকের হাত থেকে ছাতাটা কেড়ে নিয়ে সেও একবার ধেই-ধেই করে নেচে নেয়। কিন্তু ভদ্রলোকের রাগী-রাগী চেহারা দেখে সাহস পেল না। এর মধ্যে বাইরের দলটির দু'জন বল নিয়ে মোহনবাগানের গোলের দিকে এগিয়ে গেল। যাবার সময় তাদের একজনকে এদিককার কেউ শুট করবার মুখে লেঙ্গি মেরে ফেলে দিল। পেনাল্টি। মোহনবাগানের গোলকিপারের আঙুল একটু ছুঁয়ে বল নেটের ভিতর ঢুকে গেল। সমস্ত ছাতা, যা পাঁচ মিনিট আগে খোলা ছিল, বন্ধ হয়ে গেল।

এর মধ্যে উত্তর-পশ্চিম আকাশের কোণ থেকে নেমে এল সেই বৃষ্টি। এত জোর বর্ষা, মনে হল দশ মিনিটের মধ্যে মাঠে জল জমে যাবে। যেমন তাড়াতাড়ি বৃষ্টি এসেছিল তেমনই দশ মিনিট পরে আবার চলে গেল। মাঠের অবস্থা তখন খুব খারাপ। গ্যালারি ভিজে। যারা খেলা দেখতে এসেছে, সবারই জামাকাপড় ভিজে শপশপ করছে। এরই মধ্যে মাঠে একটা নতুন গোলমাল আরম্ভ হল। কে নাকি মোহনবাগানের গোলকিপারকে পিছন থেকে জাপটে ধরেছে। অন্য দলের বল শূন্যে ঘুরপাক খেয়ে নেটের মধ্যে ঢুকে গেল।

প্রথমে একটা চিৎকার উঠল, "মারো মারো, বের করে দাও। মেরে ফেরত পাঠিয়ে দাও।" মণীশ হঠাৎ দেখল, উল্টোদিকের গ্যালারিতে আগুন ধরাবার চেষ্টা হচ্ছে। বৃষ্টিতে ভেজা কাঠ ভাল করে ধরতে চাইছে না। দেবনাথ দেখল, কোথায় প্লেয়ার, মাঠের ভিতর কালো বর্ষাতিতে ঢাকা পুলিশে ছেয়ে গেছে। মণীশ বলল, "চল, সরে পড়ি।" এই বলে দেবনাথকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল। মাঠের বাইরে এসে দেখল, অবস্থা বেশ খারাপ। একদল পুলিশ ঘোড়ায় চেপে সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে শীত করছে। জলে কাদায় মণীশ আর দেবনাথ ভিড় কাটিয়ে এসপ্ল্যানেডের দিকে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। এর মধ্যে দূরে কিসের যেন একটা আওয়াজ হল। একজন কে চেঁচিয়ে বলল, "সর্বনাশ, পুলিশ গুলি ছুঁড়ছে।" সে-সব বাজে কথা, কিন্তু বোঝবার মতো মনের অবস্থা কারও ছিল না। ছুটতে ছুটতে মণীশ হঠাৎ দেখল, তার সঙ্গে দেবনাথ নেই। আর-একটু এগিয়ে মণীশ দাঁড়াল, 'দেবনাথ' বলে চিৎকার করে ডাকতে লাগল। ভিড়ের গোলমালে সে ডাক দেবনাথের কাছে পৌঁছল না। মণীশের মনে পড়ল, এরকম অবস্থায় তারা সুরেন্দ্রাথ ব্যানার্জি রোডের মোড়ে এসে দাঁড়ায় অন্যজনের অপেক্ষায়। মণীশ ছুটতে ছুটতে চৌরঙ্গিতে এসে পৌঁছল। মোড়ের কাছে দেবনাথ নেই। সে মিনিট দশেক অপেক্ষা করল। তারপর ভাবল, এর পরে বাড়ি গেলে তো বাবার সামনে পড়তে হবে। কী ঘটনা ঘটেছিল, বাবা কিছুতেই বুঝতে চাইবেন না। এই সময় একটা বাস এসে আধমিনিটের জন্য দাঁড়াল। মণীশ দেখল ফুট-বোর্ডে কোনওরকমে দাঁড়ানো

এ তুই কাকে নিয়ে এসেছিস ? এ কি বর্ধমানের ভূতনাথ মণ্ডল···

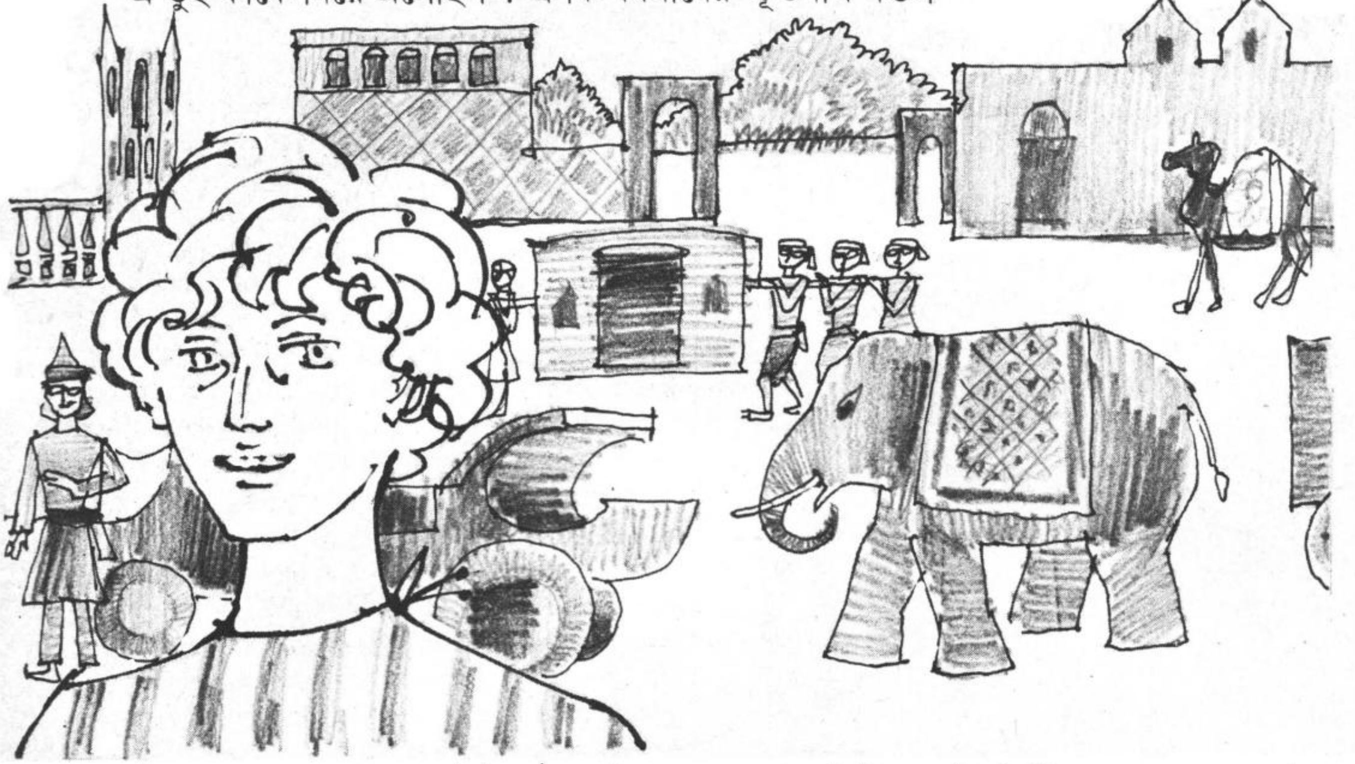

যেতে পারে। সে এক লাফে বাসে উঠে পড়ল। বাড়িতে এসে দেখে বাবা তখনও এসে পৌঁছননি। সে তাড়াতাড়ি জামাকাপড় বদলে ভালমানুষের মতো ভূগোলের বই খুলে বসল। কিন্তু তার মন সবসময় খচখচ করতে লাগল দেবনাথের জন্য। খানিক বাদে বাবা বাড়ি ফিরে খুব শোরগোল করতে লাগলেন। বৃষ্টিতে ভিজেছেন, বাসে উঠতে পারেননি ; অনেকটা হেঁটে বাড়ি আসতে হয়েছে। তখন তাঁর ফুটবল খেলার উপর খুব রাগ। মণীশ সে-রাতটা তাঁকে এড়িয়ে চলল। ভাবল পরের দিনই তো স্কুলে গিয়ে দেবনাথের সঙ্গে দেখা হবে।

পরদিন স্কুলেও দেবনাথ নেই। অঙ্কের ক্লাসে হরিপ্রসন্নবাবু বললেন, "কী হে মানিকজোড়, তোমার বন্ধুটিকে কোথায় রেখে এলে ?" মণীশ কোনও উত্তর দিল না।

আসল ব্যাপার কী হয়েছিল, মণীশ একেবারে জানত না। খেলার মাঠ থেকে দেবনাথ যখন চৌরঙ্গির দিকে ছুটছিল, একটা ঘোড়া তখন আচমকা এসে তার ঘাড়ের উপর ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে। দেবনাথ ভয় পেয়ে বাঁ দিকে সরে যায়। এমন সময় পিছনে চিৎকার ওঠে, "পুলিশ তাড়া করেছে।" এইসব গোলমাল শুনে দৌড়ে রাস্তা পার হতে যাচ্ছিল সে, তখন একটা ফিটন তার সামনে এসে দাঁড়ায়। ফিটনের কোচোয়ান বলল, "আসুন খোকাবাবু, বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।" পিছন থেকে সহিসের মতো একজন লোক বলল, "উঠে পড়ুন দাদাবাবু, এর পরে আর বেরুতে পারব না।" অন্যসময় হলে দেবনাথ কী করত বলা কঠিন, কিন্তু চেঁচামেচিতে, বৃষ্টিতে, বন্ধুকে দেখতে না পেয়ে দেবনাথ যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। সে ঠিক মণীশের মতো শক্ত নয়। গাড়িতে উঠেই চোখ বুজে ভাবল, যাক, তবু বাড়ি পৌঁছে যাব। বুকপকেটে হাত দিয়ে দেখল পাঁচ টাকার নোট দুটো ঠিক জায়গায় আছে। এর মধ্যে গাড়িটা মোড় নেবার সময় একটু থামল। সহিসের মতো লোকটা বলল, "এ কী দাদাবাবু, ভিজে জায়গায় বসে আছেন যে, ডাইনে সরে বসুন।" ডাইনে সরে বসতে গিয়ে দেবনাথের মনে হল, বাঁ হাতের উপরের দিকে কিসের একটা খোঁচা লাগল।

সেটা ২৩ জুন। ২৪ জুন ভোর হওয়ার আগে একটা নৌকো উত্তরপাড়ায় মুখুজ্যেদের বাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। তার ভিতরে দু'জন লোক। একজন সেই গাড়ির সহিসের মতো দেখতে, আরেকজন নৌকোর মাঝি। দেবনাথের তখন অল্প-অল্প জ্ঞান ফিরে এসেছে, কিন্তু মাথাটা ভারী। কী হচ্ছে ভাল করে বুঝতে পারছে না।

এমন সময় নৌকোর কাছে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। মোটর থেকে একজন ভারীমতো চেহারার লোক নৌকোর ভিতর এসে উঠল। নৌকোর দু'জনেই তাকে সেলাম করল। লোকটি সেদিকে না তাকিয়ে দেবনাথের চোখের উপর টর্চের আলো ফেলল। দেবনাথ খুব বিরক্ত হল। লোকটি বলল, "কী ভূতনাথবাবু, কী রকম থাকা হচ্ছে ?"

দেবনাথের নাম ভূতনাথ নয়, সে জবাব দিল না। লোকটা আরও এগিয়ে এল। টর্চ ফেলে আবার ভাল করে দেখল, তারপর সহিসের মুখে এক থাপ্পড় মেরে বলল, "এ তুই কাকে নিয়ে এসেছিস ? এ কি বর্ধমানের ভূতনাথ মণ্ডল ? তোকে তো ইস্কুলের সামনে সেদিন দেখিয়ে দিলাম। এক চড়ে তোর মুণ্ডু নামিয়ে দেব, জানিস্ ? তোর জন্যে কি আমার হাতে পুলিশের দড়ি পড়বে ?"

চড় খেয়ে লোকটি মুখ কাচুমাচু করে বলল, "এ কি স্যার ভূতনাথ মণ্ডল নয় ? তবে এ কে ?"

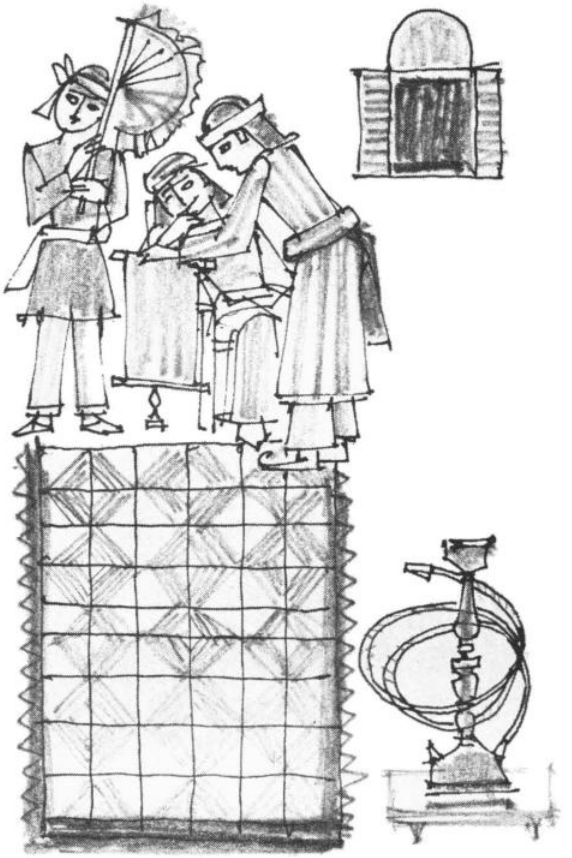

লোকটির রাগ তখনও যায়নি, বলল, "কে তা আমি কী করে জানব ? তোর কি চোখে চালশে ধরেছে ? একে শিগগির নৌকো থেকে নামিয়ে কোথাও ফেলে দিয়ে আয় ।"

লোকটি গজগজ করতে করতে মোটর হাঁকিয়ে চলে গেল । তার চলে যাবার পরে প্রায় মিনিট পাঁচেক পর্যন্ত নৌকোর লোক দুটি চুপ করে রইল । সহিসের মতো লোকটির নাম তিওয়ারি । সে বলল, "পীতাম্বর, এটা কী হল ?"

পীতাম্বর বলল, "কী হল তুই জানিস । যদি বাঁচতে চাস তা হলে যা বলে গেল, তাই কর ।"

তিওয়ারি বলল, "এখানে ফেলে রেখে যাব ? যদি শিয়াল-কুকুরে নিয়ে যায় । ।" তারা দু'জন ধরাধরি করে রাস্তার ওপারে গঙ্গার ঘাটে দেবনাথকে নিয়ে এল । সিঁড়ির শেষ ধাপে একটু একটু ঢেউ এসে লাগছে । তিওয়ারি বলল, "এখানে রেখে দে । এক্ষুনি ওপার থেকে নৌকো ছাড়বে, মাঝিমাল্লাদের চোখে পড়লে এসে নিয়ে যাবে ।"

পীতাম্বর বলল, "একটু দাঁড়া, তোর কপালে যা জুটবে সে তো বুঝতেই পারছি ।" এই বলে দেবনাথের গা থেকে শার্টটা খুলে নিল । বলল, "বিলিতি শার্ট, বিক্রি করলে ভাল পয়সা পাবি ।"

তিওয়ারি বলল, "জুতোটা দামি ।" বলে সেটাও পা থেকে খুলে নিল । পীতাম্বর শার্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখল দুটো নোট আছে । সে-কথা আর তিওয়ারিকে বলল না । বলল, "খিদিরপুরে তোর তো লোক আছে, তাকে বেচে দিস । আমাকে পরে ভাগ দিয়ে দিবি ।"

নৌকোয় গিয়ে ওঠবার সময় তারা শুনতে পেল ছেলেটি যেখানে শুয়ে ছিল, সেখানে কী রকম শব্দ হচ্ছে । তিওয়ারি বলল, "শেষ পর্যন্ত মা-গঙ্গাই নিলেন ।"

পীতাম্বর বলল, "মা-গঙ্গা কেন, কোনও বড় মাছের ঘাই হতে পারে ।"

মা-গঙ্গাও নন, বড় মাছের ঘাইও নয় । দেবনাথের কী হয়েছিল, বলি । মাথার ভারী ভাবটা কমতে লাগল । গঙ্গার ঘাটের যে সিঁড়ির উপরে সে পড়ে ছিল, সেই সিঁড়ি গঙ্গার অনেক অনেক নীচে চলে গিয়েছে । সিঁড়ি ধরে সে আস্তে আস্তে নেমে গেল, কিন্তু তার গায়ে জল লাগল না । আরও কয়েক ধাপ নেমে যাবার পর দেবনাথ দেখতে পেল সিঁড়ি শেষ হয়ে গেছে, সামনে রাস্তা । দেবনাথ হাঁটতে লাগল, না কেউ তাকে পিছন থেকে চালাচ্ছে, তা বোঝার অবস্থা তখন তার ছিল না । সামনে আলো দেখা যাচ্ছে, বাড়ির আলো । আরও কিছুদূর এগিয়ে তার মনে হল, সে একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে । মনে হল না যে, কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে । তবু সে একটা বড় ঘরে ঢুকে দেওয়ালের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল । তার সামনেই দুজন লম্বা লোক বড় পাখা নিয়ে বাতাস দিচ্ছে । পাখার ওদিকে পিছন ফিরে যিনি বসে আছেন, দেবনাথ তাঁকে ভাল দেখতে পাচ্ছিল না । তিনি অনেকটা আড়ালে, তাঁর কথাই শুধু শোনা যাচ্ছিল । তাঁর সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে, তার পোশাক দেখলে নবাবের বড় চাকুরে বলে মনে হয় । দেবনাথ দেখল লোকটির হাতে একটা বড় ম্যাপ । যাঁকে ম্যাপ দেখানো হচ্ছিল, তিনি বোধহয় সব কথা মন দিয়ে শুনছিলেন না, একটু অধৈর্য হয়ে পড়ছিলেন । ম্যাপের দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি বললেন, "ওগুলো কী ?"

যে ম্যাপ হাতে দাঁড়িয়ে ছিল সে বলল, "হুজুর, এ তো সুতানুটির উলটো দিকে গঙ্গা পেরিয়ে বেতড় গ্রাম । ব্যবসার জায়গা ।"

উলটো দিকে আঙুল দেখিয়ে প্রশ্নকর্তা বললেন, "ওগুলো আবার কী ?"

লোকটি বললে, "ওগুলো নোনা জল, হুজুর । ওদিক দিয়েও সুতানুটি আসবার কোনও পথ নেই ।"

হুজুর বললেন, "বেতড় থেকে যদি গঙ্গা পার হয়ে শত্রুরা আসে ?"

লোকটি বলল, "সেও সম্ভব হবে না, হুজুর । ইংরেজরা এখানে জমিদারি বসালে নদীর ধারে তোপ থাকবে । কার সাধ্যি নদী পার হবে । তা ছাড়া এখানে আসতেই বা যাবে কেন ? যেতে হলে তো মুর্শিদাবাদ, যেটা বাংলার নবাবের জায়গা, জগৎ শেঠেরও জায়গা, সেখানে যাবে । মুর্শিদাবাদের কী বাহার । দশটা লণ্ডনের সমান । এখানে নোনা জল, বাদা, জঙ্গল, এখানে আসতে যাবে কোন্ দুঃখে ?" মাথা ঝাঁকিয়ে হুজুর বললেন, "হুঁ ।" তারপর ম্যাপের গায়ে সই করে দিলেন ।

দেবনাথ বুঝতে পারল না, সে পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে তার নিজের সময়ের দিকে এসেছে ।

আরও একশো বছর । দেবনাথের মনে হল, সে একটা বড় শহরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে । খুব চওড়া রাস্তা । মাঝে-মাঝে দোতলা বাড়ি । এরকম রাস্তা, বাড়ির ছবি সে পড়ার বইয়ে দেখেছে । দেবনাথের মনে হল, রাস্তাটা পুরনো, এখনকার কলকাতার রাস্তার সঙ্গে মিল আছে । কিন্তু ট্রাম বাস কিছু নেই । পালকি যাচ্ছে, কিংবা ঘোড়ার গাড়ি । রাস্তায় একটা উট

শুয়ে আছে। উট থেকে দেখা যাচ্ছে একটা হাতি দূরে রাস্তা পার হচ্ছে। যাঁরা পালকিতে আছেন, তাঁরা সবাই সাহেব। লোকজনরা পালকির সামনে ছুটতে ছুটতে চলেছে, এবং থেকে-থেকে তাদের মনিবের নাম চিৎকার করে বলছে। একটা ঘোড়ার গাড়ি খুব তাড়াতাড়ি আসছিল, দেবনাথ খেয়াল করেনি। হঠাৎ সেই গাড়ির ঘোড়ার সঙ্গে ধাক্কা লাগল। যে ক'জন রাস্তায় ছিল, তারা চেঁচিয়ে উঠল। তারপর আর কিছু দেবনাথের মনে নেই।

রবিবার ২৪ জুন খুব ভোরে দেখা গেল, লাটসাহেবের বাড়ির খানিকটা দক্ষিণ-পূর্বে একটি তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলে পড়ে আছে। পরনে ট্রাউজার, গেঞ্জি। পায়ে জুতো নেই। বোধহয় পড়ে যাবার জন্য কানের একটা দিক কেটে গেছে। একটু আলো ফোটার পরে একটি-দুটি করে রাস্তার লোক ছেলেটির কাছে এসে দাঁড়াল। তারা এসপ্ল্যানেডের দিকে চলেছে, প্রত্যেকেরই হাতে একটা করে ঝোলা, দেখলে মনে হয় রাজমিস্ত্রি। একজন দেখে বলল, "এ কি মুর্দা ?" আর একজন বলল, "না, জিন্দা আছে।"

এমন সময় একটা রবারের বল লাফাতে লাফাতে সেইখানে এসে থামল। তার মালিক আট-দশ বছরের একটি ছেলে। সে ব্যাপারটা একটু দেখে ছুটে গিয়ে একটু দূরে গাড়িতে তার বাবাকে খবর দিতে গেল। বাবা গাড়ি থেকে নেমে এলেন। তারপর পুলিশের গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতাল।

শেষ পর্যন্ত খবর এসে পৌঁছল দেবনাথের বাড়িতে। বিকেলের দিকে দেখা গেল দেবনাথ তার ছোট ঘরে নিজের খাটে শুয়ে আছে। মাথার কাছে মা বসে আছেন। দরজার কাছে একজন নার্স। মণীশ নীচে ঘুরঘুর করছে। দেবনাথের বোন ইন্দুমতী তাকে দাদার ঘরে ডেকে নিয়ে এল। দেবনাথের চোখ খোলা, কিন্তু মনে হচ্ছে কাউকে চিনতে পারছে না। মণীশের দিকে খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল, তারপর চোখ বুজে বিড়বিড় করে বকতে লাগল।

নীচে দেবনাথের বাবার বসবার ঘরে তখন দেবনাথের বাবা ও কাকা বসে দেবনাথের চিকিৎসার কথা বলাবলি করছেন। ডাক্তার অনেকক্ষণ ছিলেন, এখন চলে গিয়েছেন, আবার সন্ধের পরে আসবেন। দেবনাথের কাকা ব্যারিস্টারি করেন। তিনি তাঁর দাদাকে বললেন, "ডাক্তার যখন বলছেন, তখন একবার সাইকো-এনালিসিস করে দেখলে হয়। শরীরে কিছু আছে বলে মনে হয় না। মাথাটা একটু কীরকম হয়ে গিয়েছে। কখনও বলছে 'বেতড়', কখনও বলছে 'শেঠেদের কুঠি', কখনও বলছে 'কত বড় হাতি'। ডাক্তারবাবু তো মন্দ কথা বলেননি।"

এই সময় পাশের রাস্তার ভোলানাথবাবু এসে উপস্থিত হলেন। ভোলানাথবাবু একসময় প্রোফেসারি করতেন, ইতিহাসের প্রোফেসর। কিন্তু ইতিহাসের লোক হলে কী হবে, তিনি অঙ্ক, দর্শন সব বিষয়েই লেখাপড়া করতেন। তবে লেখাপড়া যতই করুন, সাধারণ খেয়াল খুব কম। ভুল ক্লাসে গিয়ে পড়াতে বসতেন। ছাত্ররা তাঁকে ভোলামাস্টার বলত। এখন অবশ্য মাস্টারি ছেড়ে দিয়েছেন। বলছেন, "অতগুলো গাধাকে বুদ্ধিমান করা আমার সামর্থ্যে কুলোয় না।" এখন হরেক লাইব্রেরিতে ঘুরে বেড়ান। তিনি এসে দেবনাথের বাবার টেবিল থেকে একটা সিগার তুলে নিলেন। বললেন, "এসব হচ্ছে কী ? দেবনাথ যা বলছে সত্যি কথা। তা সত্যি কথা স্পষ্ট করে বলছে, তার আবার অ্যানালিসিস কী ? জগৎশেঠ আর হাতি অ্যানালিসিস করলে কী বেরোবে শুনি ?"

দেবনাথের কাকা বললেন, "তুমি একটা অসম্ভব ব্যাপারকে মেনে নিতে বলছ।"

ভোলানাথবাবু বললেন, "অবিশ্বাস্য কোথায় হল ? বেতড় গ্রাম এখনও আছে, আর কলকাতায় হাতি তখনও ছিল, এখনও আছে, তবে এখন শুধু সার্কাসের সময় আসে, এই যা। মেজদার কথা ছেড়েই দিচ্ছি, বড়দা, তুমি ব্যবসা-ট্যবসা করে বুদ্ধিশুদ্ধি সব গুলিয়ে ফেলেছ। তুমি তো একসময় লেখাপড়া করতে। তুমি কি ফিলসফি কি অঙ্কের বইতে ডান-এর নাম শোননি। ডানসাহেব তো প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, একসঙ্গে দুটো বিভিন্ন কালে একজন থাকতে পারে। প্রথম যুদ্ধের পরে এক বর্ষার দিনে প্যারিসের কাছে ভারসেইতে কী হয়েছিল ? ভুলে গিয়ে থাকলে পড়ে দেখবে। অবশ্য তোমাদের ছেলে, যা ইচ্ছে তাই করবে, পরে আমাকে কিছু বলতে পারবে না।" এই বলে ভোলানাথবাবু ডিবে থেকে দুটো পান তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

দেবনাথের বাবা বললেন, "এখন আবার চললে কোথায় ?"

ভোলানাথবাবু বললেন, "তোমাদের তো বোঝাতে পারব না, যাই একবার ন্যাশনাল লাইব্রেরির ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলে আসি।"

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

একবার আইনস্টাইনের কাছে একটা চমৎকার অনুরোধ এল। কী সেই অনুরোধ ? তাঁকে ইজরায়েলের রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করতে হবে। তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে জানালেন, প্রকৃতির রহস্য যদিও বা বুঝি, কিন্তু মানুষের রহস্যের কিচ্ছু বুঝি না।

●

উইল ডুরান্টের একটি বই ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গীকৃত 'দি কেস ফর ইণ্ডিয়া' নামে এই বইটির একটি জায়গায় লেখা আছে, শুধু আপনার জন্যেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পাওয়া উচিত।

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধের সঙ্গে
দাঁতের হয়তো কোনো
সম্বন্ধ থাকে না–

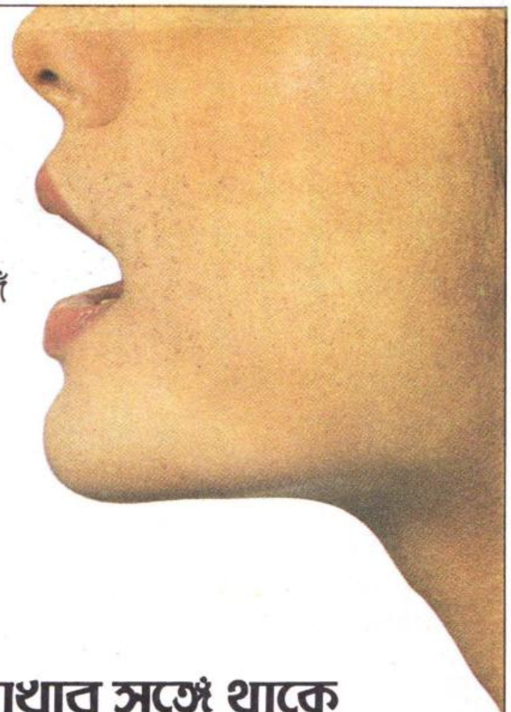

কিন্তু, মাড়ি সুস্থ রাখার সঙ্গে থাকে অতি নিকট সম্বন্ধ!

আপনার মাড়ি যদি মজবুত না হয়, তাহলে নিঃশ্বাসেও দুর্গন্ধ হতে পারে — আর, তা ডাক্তারি মতেও সত্যি ব'লে প্রমাণিত—

অর্থাৎ, শুধু দাঁতের আপনি যত যত্নই নিন না কেন, কোনো লাভ হবে না —তা, সে আপনি যত স্বাদগন্ধযুক্ত টুথপেষ্টই ব্যবহার করুন।

তবে, একটি এমন প্রমাণিত উপায় রয়েছে, যা দিয়ে দাঁত ও মাড়ি দুইয়েরই যত্ন নেওয়া সম্ভব — যা হ'ল, সুবিখ্যাত ফরহ্যান্স উপায়।

ফরহ্যান্স শুধু এক সাধারণ টুথপেষ্টই নয় — এটি বিশেষভাবে তৈরী করেন এক দাঁতেরই ডাক্তার — যিনি, দাঁত সুস্থ রাখার সঙ্গে মাড়িরও যে কত অত্যাবশ্যক গুরুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ থাকে তা ভালরকম বুঝেছিলেন।

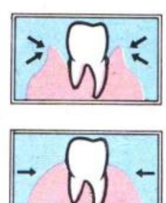

দুর্বল মাড়ি দাঁতকে ধরে রাখতে পারে না, যার ফলে দাঁতে দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী পোকা ধরতে পারে।

ফরহ্যান্স-এ এক বিশেষ অ্যাস্ট্রিঞ্জেন্ট থাকে যা মাড়িকে সত্যি সত্যিই শক্ত করে আর দাঁতকে সুদৃঢ় ও সুস্থ রাখে আর ফলে, আপনার নিঃশ্বাসও হয়ে ওঠে সাফ ও তরতাজা।

তাই, ফরহ্যান্স ব্যবহার করা এখনও না শুরু করে থাকলে, আজই শুরু করুন। তারপর, যত বছরের পর বছর পার হতে থাকবে, তত বুঝতে পারবেন যে, লক্ষ লক্ষ লোক ফরহ্যান্স-এর বিশেষ যত্নের ওপর কেন এত আস্থা রাখে।

ফরহ্যান্স – আপনার মাড়ির জন্যে তৈরী টুথপেষ্ট

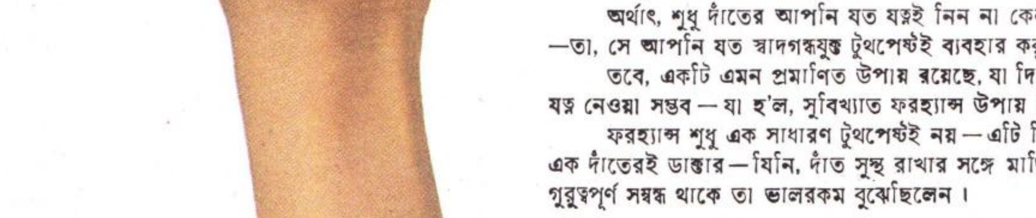

এবার
এক
আকর্ষণীয়
নতুন প্যাকে!

403-GM-244 BEN

সুদূর লিবিয়ায়

অর্ণব দাঁ

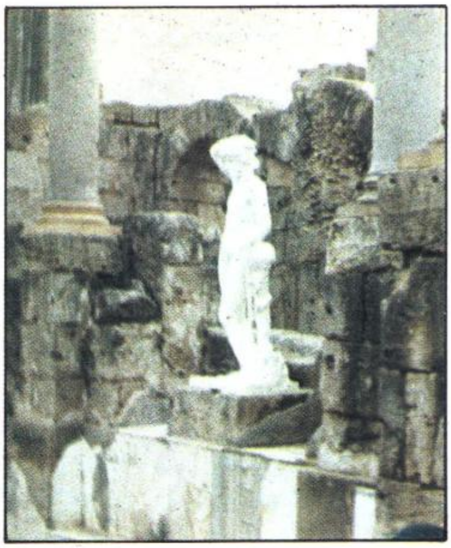

রোমানদের সময়কার স্নানাগার

ত্রিপোলি (ঝকঝকে শহর, পাশেই সমুদ্র)

"ফাসেন ইওর সিট-বেল্ট, উই আর নাউ ল্যান্ডিং অ্যাট ত্রিপোলি এয়ারপোর্ট।" পাইলট ঘোষণা করলেন। তারপর বিশাল জাম্বো বিমান ধীরে-ধীরে রানওয়ের ওপর নেমে এল।

আমি গত ডিসেম্বরে কলকাতা থেকে লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলি বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমার বাবা গত দু'বছর যাবৎ লিবিয়াতে আছেন।

ডিসেম্বরের ১২ তারিখে সকাল সাড়ে-এগারোটায় কলকাতা থেকে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমানে বম্বে এবং সেখান থেকে রাত ন'টার সময়ে সুইস-এয়ারে চেপে সোজা গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে এসে পৌঁছই ভোরবেলায়। সেখানে প্রায় বারো ঘণ্টা কাটিয়ে ১৩ তারিখ বিকেল পাঁচটার সময় ত্রিপোলি আসি।

এথেন্স থেকে ত্রিপোলি আসার সময়ে লিবিয়ান এয়ারলাইন্সে উঠেছিলাম। প্লেনের জানলা দিয়ে প্রাকৃতিক শোভা দেখতে-দেখতে আসছিলাম। বিকেলের দিকে সূর্যের আলোয় অপূর্ব দেখাচ্ছিল আকাশটা।

মেঘের সমুদ্রে আমাদের উড়োজাহাজটি ছিল একমাত্র জাহাজ। সেটি ধীরে-ধীরে গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে চলেছিল। কিছুক্ষণ পরে আমাদের বিমান ভূমধ্যসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে লাগল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! সমুদ্রের জল যে এত নীল চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। হঠাৎ দূরে সরু রেখার মতো তটভূমি দেখা গেল। ক্রমে বিমানের ছোট জানলায় লিবিয়ার ত্রিপোলি শহর স্পষ্ট হয়ে উঠল। বাড়িঘরগুলি এতই ছোট দেখাচ্ছিল যে, প্রথমে মনে হয়েছিল লিলিপুটদের দেশে এসে পড়েছি। বিমান যত নীচের দিকে নামতে লাগল ত্রিপোলি শহরটি তত স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। মনটা নেচে উঠল অজানা এক দেশ দেখার আনন্দে। অবশেষে বিমান রানওয়ের ওপর এসে থামল।

ত্রিপোলি এয়ারপোর্টটি দেখতে খুব সুন্দর, চারদিক ঝকঝকে তকতকে। পাশপোর্ট হাতে নিয়ে ইমিগ্রেশন কাউন্টারে গেলাম। আমার পরিচয় দেখে ভিসার উপর ছাপ দেওয়া হল, অর্থাৎ দেশের ভেতরে ঢোকার অনুমতি পেলাম। স্যুটকেস হাতে নিয়ে কাস্টম্‌স পার হতেই দেখি বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। বাবার সঙ্গে এয়ারপোর্ট বিল্ডিংয়ের বাইরে আসার সময় শুনলাম আমার যাত্রা এখানেই শেষ নয়। আরও আড়াইশো কিলোমিটার দূরে মিশুরাটা শহরে যেতে হবে। তাই জাপানি গাড়ি ডাট্‌সনে চেপে সেদিনের মতো একটা হোটেলে এলাম। তখন রাত প্রায় আটটা। খুব ক্লান্ত লাগছিল, তাই শুয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে হোটেলের জানলা দিয়ে লক্ষ করলাম কর্মব্যস্ত আধুনিক শহর ত্রিপোলিকে। কী বিরাট-বিরাট রাস্তা আর কী অজস্র গাড়ির স্রোত। ছ'টি রো'তে গাড়ি পাশাপাশি ছুটে চলেছে। রাস্তা ঝকঝকে, পরিষ্কার; কোথাও কোনও গর্ত বা ময়লা নেই।

সকাল আটটার সময় ব্রেকফাস্ট খেয়ে একটি ফরাসি গাড়ি পিজোতে চেপে বসলাম। এখানকার ট্যাক্সিতে সাধারণত তিন সারিতে আটজন বসতে পারে। আমরা দু'জনে পেছনের সারিতে বসলাম। ট্যাক্সির ভেতরটা খুব সুন্দর, ক্যাসেট-প্লেয়ারে বাজনা বাজছে।

কিছুক্ষণ বাদে ত্রিপোলি শহর ছেড়ে ট্যাক্সি হাইওয়েতে উঠে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলল। সে এক নতুন অভিজ্ঞতা। বাইরের গাছপালা চোখের নিমেষে সরে যেতে লাগল। রাস্তার ধারে-ধারে খেজুরগাছ, অলিভগাছ ও মাল্টারগাছ (এক ধরনের লেবুর গাছ) পথের শোভাবর্ধন করছে। মাঝে-মাঝে এক-একটা লোকালয়, তার পরেই বিশাল বালুময় প্রান্তর।

আমার চোখে সবই নতুন-নতুন লাগছে। অবশেষে খোম্‌স্ সমুদ্রের তীরে অবস্থিত ছোট শহর পেরিয়ে গেল এবং জেলাতিন শহর ছাড়িয়ে ট্যাক্সি এসে ঢুকল মিশুরাটা শহরে। একটু বাদে বাবার কোয়ার্টারে এসে ট্যাক্সি থামল। মা তখন আমার জন্যে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রায় এক বছর বাদে বাবা, মা আর ভাইকে একসঙ্গে পেয়ে কী যে আনন্দ হয়েছিল আমার, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।

মিশুরাটা উপকূলবর্তী একটি শহর। বর্তমানে শহরটিকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। চারিদিকে শুধু বাড়ি আর রাস্তা তৈরি হচ্ছে। এখানে জার্মানি, জাপান, অস্ট্রিয়া, ইতালি প্রভৃতি দেশের সহযোগিতায় একটা বড় স্টিল প্ল্যান্ট তৈরি হচ্ছে। সবচেয়ে গর্বের বিষয় যে, সেই কারখানা তৈরির ব্যাপারে পরামর্শ দিচ্ছেন ভারতীয় ইঞ্জিনিয়াররা, এঁদের মধ্যে আমার বাবাও আছেন। বাবার কাছে শুনলাম এখানকার পুলিশ প্রশাসন অত্যন্ত কড়া এবং আইনভঙ্গকারীকে গুরুদণ্ড পেতে হয়। তাই চুরি হয় না। লোকজন বাড়ির বাইরেও দামি জিনিসপত্র ফেলে রাখতে পারে।

লিবিয়া, অর্থাৎ লিবিয়ান আরব রিপাবলিক (এল· এ· আর·) দেশটি ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলে এবং আফ্রিকা মহাদেশের উত্তরে অবস্থিত।

প্রতিবেশী দেশ হল পিরামিডের দেশ মিশর। লিবিয়ার প্রতিবেশীদের মধ্যে মিশর ছাড়া সুদান, চাদ, নাইজার, টিউনিসিয়া ও আলজিরিয়া আছে। সবই মুসলিম দেশ। দক্ষিণে বিশাল এলাকা সাহারা মরুভূমির সঙ্গে যুক্ত। এখানকার মানুষদের ইউরোপিয়ানদের মতো ফরসা দেখতে ; স্বাস্থ্য ভাল ও চেহারা সুন্দর। তবে কিছু-কিছু কালো চামড়ার লিবিয়ানও চোখে পড়ে। প্রত্যেকেই কম-বেশি ধনী। গাড়ি চড়তে ও চালাতে ভালবাসে। খুব কম লোকই পথে হাঁটে। পুরুষরা কুর্তা-পাজামা এবং মেয়েরা আলখাল্লা-জাতীয় পোশাক পরে। তবে কমবয়সী ছেলেমেয়েরা ইতালিয়ানদের মতো জামাকাপড় পরতে ভালবাসে। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর প্রভাবে উপকূলবর্তী শহরে আবহাওয়া খুবই মনোরম। প্রায় সাত-আট মাস বৃষ্টি হয় না, কিন্তু রাত্রে ঠাণ্ডা ভাব থাকে। নভেম্বর থেকে মার্চ মাস শীতকাল এবং মাঝে-মাঝে বৃষ্টি হয়। সবসময় গরম জামাকাপড় পরতে হয়। আমি শীতকালে গিয়েছিলাম তাই সবসময় সোয়েটার, ফুলহাতা জামা পরে থাকতে হত। অবশ্য ঘরে রুম-হিটার থাকায় বাইরের ঠাণ্ডা বোঝা যেত না তেমন। লিবিয়া মরুভূমির দেশ হলেও সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে চাষ হতে দেখেছি। ট্রাক্টর দিয়ে ও মেসিনের সাহায্যে জল ছিটিয়ে উন্নত প্রথায় চাষের চেষ্টা চলছে সর্বত্র। তবে বেশিরভাগ জিনিসপত্র বিদেশ থেকে আনতে হয়। অলিভ অয়েল খুবই শস্তা। লিবিয়ায় অনেক তৈলখনি আছে। পেট্রোলিয়াম রপ্তানি থেকেই দেশের প্রধান আয়।

সব শহরে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে পাওয়া যায়। লিবিয়ায় এর নাম 'জামাইয়া'। এখানে চাল, ডাল, দুধ, মাখন, মাছ, মাংস, জামাকাপড়, ইলেকট্রিক্যাল জিনিসপত্র—রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি পাওয়া যায়। এক-একটি জামাইয়া মানে বিশাল দোকান এবং ভিতরে আছে অনেক ডিপার্টমেন্ট।

আমি মিশুরাটা শহর থেকে লেপটিস মাগনা, তামিনা, সির্থ, তারহুনা, ঘরিয়ান, জেলিতন ইত্যাদি জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কালের প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ লিবিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। যেমন আলবেদার, সিরেন, ত্রিপোলির পশ্চিমে সাবরাথা, লেপটিস মাগনা। ত্রিপোলি ও মিশুরাটার মাঝখানে খোম্‌সের পাশেই লেপটিস মাগনা। প্রাচীন রোমান সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ বালির ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এখানে অ্যাম্‌ফিথিয়েটার, বিশাল আর্চ, বিভিন্ন প্রস্তরমূর্তি, রথ চলার রাস্তা প্রভৃতি দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়।

একদিন মিশুরাটা ছেড়ে আরও পূর্বদিকে সির্থ শহর দেখতে গিয়েছিলাম। পথে তামিনায় মরূদ্যান দেখেছি। সির্থ সমুদ্রের ধারে ছোট্ট শহর, এখানকার প্রধান কর্নেল গাদ্দাফির জন্মস্থান। হাইওয়ের ওপর দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ দেখি রাস্তা প্রায় দ্বিগুণ চওড়া হয়ে গেছে। সির্থ শহর ছেড়ে যাবার পর আবার আগের মতো হাইওয়ে পড়ল। দুই প্রান্তে চেক্‌পোস্ট। পরে জানলাম, দরকার হলে রাস্তার ওপরে বিমান সোজা নেমে পড়তে পারে। তাই রাস্তার ধারে টারমিনাল বিল্ডিং, প্লেন ওঠা-নামার সংকেত-ব্যবস্থা, রাস্তার ওপরে ল্যাণ্ড-মার্কিং ইত্যাদি গাড়ি করে যেতে-যেতে চোখে পড়ল। লিবিয়ার মরুভূমিতে অনেক ছোট-বড় জলাশয় আছে কিন্তু সারা দেশের কোথাও নদী নেই। একদিন গাড়ি চড়ে মরুভূমির বুক চিরে পশ্চিম প্রান্তে ঘাদামেস বেড়িয়ে এলাম। ঘাদামেস সব থেকে বড় মরূদ্যান। এটি পর্যটকদের কাছে বেশ আকর্ষণীয়। তবে আমার কাছে বেশি ভাল লেগেছে ঘাদামেসের পথে মরুভূমির ভেতর দিয়ে গাড়ি চেপে যাওয়া। সুন্দর রাস্তা, কিন্তু রাস্তা বালিতে ঢেকে গেছে অনেক জায়গায়। ফলে গাড়ি রাস্তা ছেড়ে বালির ওপরে চলে যেতে পারে। সেই আশঙ্কায় খুব সাবধানে রাস্তার নিশানা ধরে আমাদের গাড়ি চলছিল। পথে উটের পাল চোখে পড়ল। বইতে উটের পাল, ক্যারাভানের কথা পড়েছিলাম, কিন্তু নিজের চোখে দেখলাম এই প্রথম।

সারা দেশে বহু মসজিদ, যাতে সবাই আজানের ধ্বনি শুনতে পায়। গুর্জি মসজিদের কারুকার্য আমার বেশ ভাল লেগেছে।

ত্রিপোলি শহরের প্রাচীন তুরকি দুর্গটিও দেখার মতো। এটি খ্রিষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত। বর্তমানে দুর্গটি একটি বিখ্যাত জাদুঘরে পরিণত হয়েছে। এই জাদুঘরের নানা ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যবস্তু নিঃশব্দে লিবিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের কথা জানিয়ে দেয়। ত্রিপোলির বন্দর, বিশ্ববিদ্যালয়, বিশাল-বিশাল অট্টালিকা, সাততলা উঁচু জামাইয়া, স্টেডিয়াম, জাতীয় গ্রন্থাগার ইত্যাদি দেখলে মনে হয়, একটি দেশকে সুন্দর ভাবে সাজানোর চেষ্টায় কোনও ত্রুটি নেই। যতটা সম্ভব ঘুরে দেখেছি। তবুও অনেককিছুই না দেখার আফসোস নিয়ে প্রায় তিন মাস ছুটি কাটাবার পরে গত ৫ মার্চ কলকাতা ফেরার জন্যে বিমানে উঠেছিলাম। বাবা-মা'কে ছেড়ে আসার জন্যে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশ বিমান দুবাইয়ের উদ্দেশে লিবিয়ার মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ল। তখন কানে বাজছিল অ্যারিস্টটলের বাণী —— 'ফ্রম লিবিয়া অলওয়েজ কামস্ সামথিং নিউ।'

নিনির বুকের মধ্যে থেকে কান্নার স্রোত উঠে আসছিল…

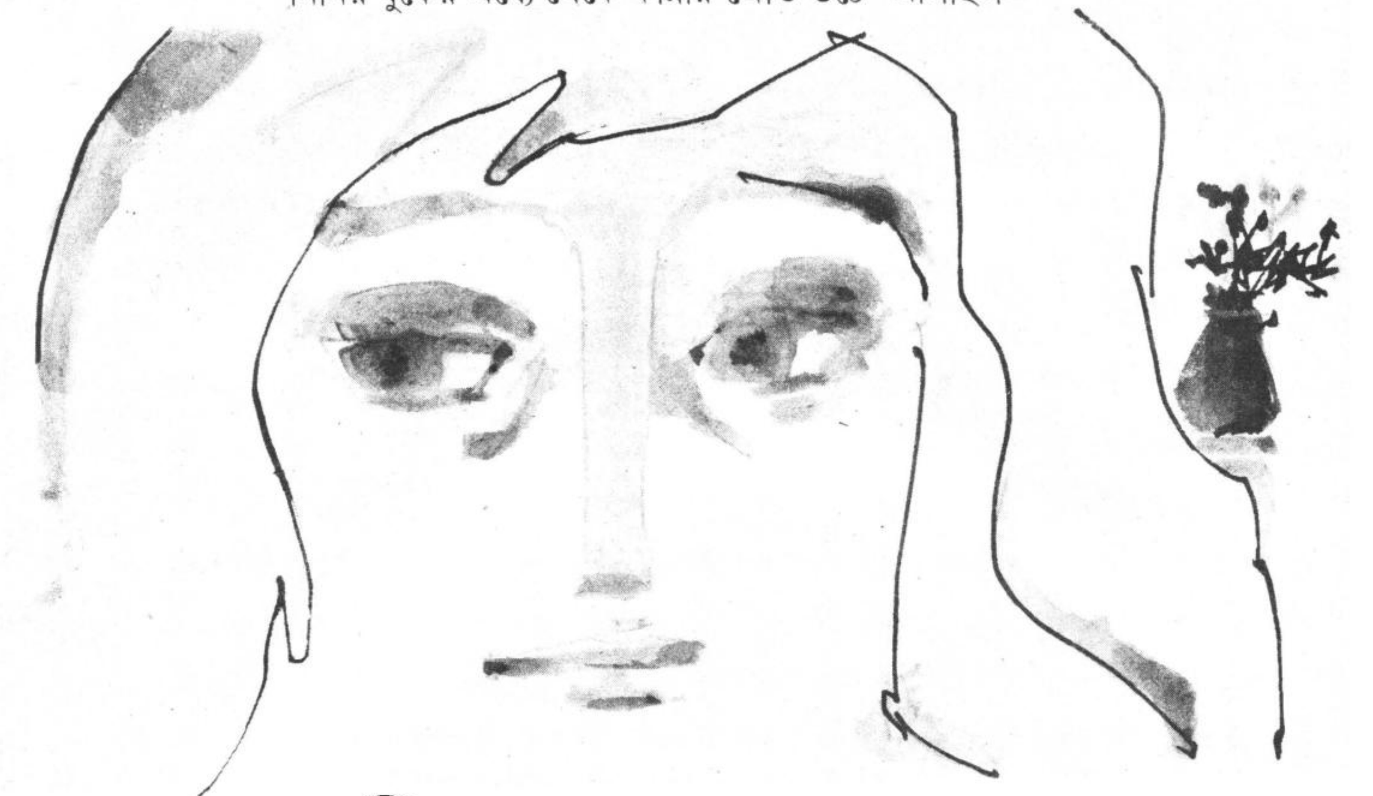

জন্মদিনের দুঃখ

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

খুব ভোরবেলাতেই ঘুম ভেঙে গেল নিনির। আকাশটা কেমন আলতো এক নীল রঙে ভরে আছে তখন। যেন টোকা মারলেই সব নীল রঙ ঝুরঝুর করে ঝরে গিয়ে সাদা ফ্যাটফেটে দিনের আলো বেরিয়ে আসবে। বিছানায় শুয়ে-শুয়েই জানলা দিয়ে চোখ পিটপিট করে আকাশ দেখে নিনি। এমন হয় বুঝি ভোরবেলাকার আকাশ। ও আর জানবে কেমন করে, এত সকালে কি কোনওদিনও ঘুম থেকে উঠেছে নাকি নিনি? পরীক্ষার সময় তো মা রোজই চেঁচামেচি করেন, “এত রাত জাগিস না নিনি, এ কী বিচ্ছিরি স্বভাব তোমার। ভোরবেলায় উঠে চোখে-মুখে জল দিয়ে বই খুলে বসলে পড়াটাও তো কত ভাল করে তৈরি হয়।”

নিনি জানে, রাগের মুহূর্তে মা তাকে ‘তুমি’ সম্বোধন করতেই বেশি পছন্দ করেন। মা রাগ করলে গলায় কান্নার ডেলা আটকে আসে তার। কিন্তু কী করবে সে? ভোরবেলায় ঘুম থেকে ওঠা তার পক্ষে অসম্ভব শক্ত কাজ। এবারও তো ফিজিক্যাল সায়েন্স পরীক্ষার আগে রাত দুটো অবধি জেগে জেগে পড়েছে ও। কিন্তু তাই বলে রাত জেগে পড়ার জন্য মার্কস বুঝি খারাপ পেয়েছিল সে পরীক্ষায়?

“হুঁঃ, বড়রা শুধু-শুধুই বকুনি দিতে ভালবাসেন।”

এটাই নিনির শেষতম সিদ্ধান্ত।

যাই হোক, আজ কিন্তু ঠাকুমাও ওঠেননি এখনও। অন্যদিন ঠাকুমা উঠে স্নান সেরে যখন পুজোয় বসেন, নিনি তখনও পাশবালিশ কোলে দিয়ে আরাম করে ঘুমোয়। ঠাকুমা’র ঘণ্টা নাড়ার শব্দেই অধিকাংশ দিন ঘুম ভাঙে তার।

কোনও কোনওদিন কাকামণি জগিং সেরে এসে হাঁফাতে-হাঁফাতে ওর খাটের ওপরেই ধুপ করে বসে পড়ে। কাকামণির কি আর বেলা পর্যন্ত ঘুমোনোর সুযোগ আছে! যা মোটা হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন, স্বাস্থ্যচর্চা না করে উপায় কী? নিনি তো একদিন মুখ ফসকে বলেই ফেলেছিল, “উঃ, কাকামণি, দু’দিন পর লোকে তোমাকে ভুঁড়িদাসবাবু বলে ডাকবে যে!”

সেদিন কিন্তু কাকামণি সিরিয়াসলি চটে গিয়েছিল। নিনির চুলের মুঠি ধরে চেঁচিয়ে উঠেছিল, “বৌদি, তোমার এই কন্যারত্নটিকে ভাল করে শাসন করা দরকার; লঘু-গুরু জ্ঞান নেই ওর।”

তা, নিনিকে সুখে ঘুমোতে দেখলে ও হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরে। কে না জানে, এই সকালবেলার ঘুমটাই হল সবচেয়ে আরামের! তাই এক-একদিন মশারির ফাঁক দিয়েই কাকামণি নিনির গায়ে খোঁচা মারে, “অ্যাই কুঁড়ের বাদশা, উঠে পড়। দু’দিন পরে মাধ্যমিক দিতে হবে, দেখে কে বলবে যে ক্লাস নাইনের ছাত্রী!”

সকালবেলায় মা নিনিকে নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার সময় পান না মোটেই। বাপির অফিসের ভাত, কাকামণির কলেজের তাড়া, তার স্কুলের টিফিন, এ-সবই চলে আসে পর-পর। তা ছাড়া বাপিকে বাজারে পাঠানো নিয়েও চলে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড। নিনি শুয়ে-শুয়েই দেখতে পায়, মা বাপির হাতে চায়ের কাপ আর বাজারের ফর্দ ধরিয়ে দিয়ে রান্নাঘরে চলে যাচ্ছেন, কিন্তু

বাপির যেন কোনও তাড়াই নেই। ধীরেসুস্থে চা শেষ করে খবরের কাগজ খুলে ধরলেই জগতের আর সবকিছুর কথা ভুলে যান বাপি। শেষকালে মা এসে আরও দু-চারবার তাড়া লাগানোর পর তিনি ব্যাজার মুখ করে বাজারের দিকে রওনা হন।

বাজার করে আনার পরও কি শান্তি আছে ? মা যদি আনতে বলেন বেগুন তো বাপি এনে হাজির করেছেন পটল কিংবা পালংশাক। মায়ের করে দেওয়া ফর্দ বাপির পকেটেই থেকে যায়। নিনি এসব দেখে নিজের মনেই হাসে। সে তো জানে আসল ব্যাপারটা, বাজারে যেতেই সমরেশকাকু 'এই যে সন্তোষ' বলেই বাবার পিঠে এক থাব্‌ড়া বসিয়ে দেন ; তারপর আর কী, দু' বন্ধুতে মিলে গল্প আর গল্প। শেষে যখন বাজার করার কথা খেয়াল হয়, তখন তাড়াহুড়োর মাথায় বাপি যা পান, তাই-ই থলেতে ভরেন।

এই তো কালকেই, বাপি বিজয়ীর হাসি হেসে থলে থেকে বার করলেন মস্ত ইলিশ মাছ। নিনির তো খুব ফুর্তি অমন চকচকে মাছটাকে দেখে। কিন্তু মাকে খুশি করা বেজায় কঠিন কাজ। মা অমনি চটে উঠলেন, "মাছটা রাঁধব কী দিয়ে ? কিছুই তো সব্‌জি আনোনি সঙ্গে !"

বাবা যত বোঝাতে চাইছেন যে মাছ কিনতেই বাবার টাকা ফুরিয়ে গেছে, মা কিছুতেই বুঝবেন না সে-কথা। অবশেষে কাকামণি এসে সহজ সমাধানের পথ বাতলে দেয়। বলে, "রাগ কোরো না বউদি। মুসুর ডাল দিয়ে ইলিশের ডিমভাজা আর তার সঙ্গে মাছের ঝোল, গ্র্যাণ্ড লাঞ্চ হবে ! তরিতরকারির দরকার কী ?"

এইসব ঝক্কিঝামেলা সামলাতেই তো মায়ের সকাল কেটে যায়। নিনির দিকে নজর পড়ে না বিশেষ। এক-একদিন অবশ্য কপালে বিপদ থাকলে কাকামণির চেঁচামেচিতে মা'ও এসে যোগ দেন। মা'র ভাবটা এমন, সামনের মাসেই যেন তাকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে বসতে হচ্ছে। শেষে যখন মা বলেন, "ফেল করলে আমি কিন্তু ছবিমাসিকে ছাড়িয়ে দেব। বাসনমাজা, ঘর-মোছাটোছার কাজ সব তোমাকেই করতে হবে।" নিনি তখন তড়াক করে লাফ দিয়ে খাট থেকে নেমে পড়ে। এসব অসম্মানজনক কথাবার্তার পরেও আর ঘুমিয়ে থাকা যায় নাকি ? যত রাগ গিয়ে পড়ে কাকামণির ওপর। কে বলেছিল ওকে অমন গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে ? পারলে বুঝি কাকামণিকে ভস্মই করে দেয় নিনি। কিন্তু যা মোটা শরীর কাকামণির, তাকে ভস্ম করা শিবেরও অসাধ্য !

আজ কিন্তু আর একটুও শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না নিনির। ডিং-ডং ! কলিংবেল বেজে উঠল। নিশ্চয়ই ছবিমাসি এসে পড়েছে কাজ করতে। ঠাকুমা ওঠার আগেই নিনি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেয়।

"কী রে দিদুন, আজ যে এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়লি ?"

মুচকি হেসে ঠাকুমাকে পাশ কাটিয়ে বেসিনের দিকে চলে গেল নিনি। তার মনের মধ্যে যে আজ কত তোলপাড় হচ্ছে, তার খবর ঠাকুমা জানবেন কেমন করে ?

মুখ ধুয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায় নিনি। আশেপাশে সকালবেলার ব্যস্ততা জেগে উঠেছে। পাশের ফ্ল্যাটের পাপিয়া স্কুলে যাচ্ছে। ওকে দেখে নিনি একটা খুশির নিশ্বাস ছাড়ে, "যাক্‌ বাবা, আমার তো আজ ছুটি।"

"নিনি।" তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মা'র ডাক শুনতে পায় সে। ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখে, ঠাকুমা চোখ বুজে বিড়বিড় করে মন্ত্র জপ করছেন। তাঁর পুজোর ঘরে আজ স্পেশ্যাল আয়োজন। অন্যদিন ভোগের থালায় থাকে নকুলদানা আর আজ ঠাকুরদের জন্য সন্দেশভোগের ব্যবস্থা। আজ যে নিনির জন্মদিন।

এত সকালে মিষ্টির দোকান খোলে না বলে ঠাকুমা কাল রাতেই পাড়ার দোকান থেকে মিষ্টি আনিয়ে রেখেছেন। নিনি কাল পড়তে বসে ঠাকুমা'র গলা শুনতে পেয়েছিল, মাকে বলছিলেন, "বউমা, ভাল করে জলের ওপর বসিয়ে রেখো বাক্সটা, নয়তো পিঁপড়ে ধরে যাবে।"

নিনি ঘরে ঢুকতেই কাকামণি একটা সশব্দ হাসি দিয়ে উঠল, "আরে, জন্মদিনের আনন্দে রাতে ঘুমোসনি নাকি ? এই নে, ধর।"

ফুলতোলা কাগজের প্যাকেট থেকে বইটা বার করতে করতে কাকামণিকে 'থ্যাংক ইউ' বলে নিনি। তারপর গল্পের বইটা একটু উলটে-পালটে দেখে টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে মায়ের দিকে তাকায় সে। মায়ের মুখটা আজ সকালবেলাতেও বেশ হাসি-হাসি। হাসিমুখেই নিনিকে বলে ওঠেন মা, "কী রে, বইটা তো নিলি, প্রণাম কর কাকামণিকে।"

নিনি সবাইকেই প্রণাম করে। বাপি আজ নিজে থেকেই বাজারের ব্যাগ নিয়ে রেডি হয়ে রয়েছেন। মা আপনমনেই বলে উঠলেন, "যাই, পায়েসের চাল বার করিগে।"

অমনি নিনি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, "আজ পায়েস রেঁধো না মা, প্লিজ !"

"সে কী !" ছ'জোড়া চোখ একই সঙ্গে অবাক বিস্ময়ে তাকায় নিনির দিকে। বাড়ির মধ্যে নিনিই তো পায়েস খেতে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। আসল রহস্যটা এবার ভাঙে নিনি। প্রায় ঝাঁঝিয়েই ওঠে সে, "বা রে, প্রশান্ত সেনগুপ্ত মোটেই পায়েস খেতে ভালবাসেন না, জানো না বুঝি ? ওঁর একটা ইন্টারভ্যুতে পড়েছি, উনি নোন্‌তা খাবারই বেশি পছন্দ করেন।"

হো-হো করে হেসে ওঠেন বাবা। আর হাসি চেপে মা বললেন, "আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ওঁকে পায়েস না দিলেই হবে'খন, আরও কত কিছুই তো রান্না করা হচ্ছে।"

পাশ থেকে টুক্‌ করে বলে ওঠে কাকামণি, "তোমাদের মাননীয় অতিথি আসেন কি না সেটাই সন্দেহের বিষয়। বুবুর কথা তো, হয়তো রাজিই হলেন না।"

রাগে গা জ্বলে যায় নিনির। ছুটে ও-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পড়ার টেবিলে বসে সে। মনে-মনে গজগজ করতে থাকে, "গুরুজনদের কথাবার্তার ধরনই এরকম। আসবেন না মানে ? বুবুপিসিকে এত যিনি ভালবাসেন, ওর কথা তিনি শুনবেন না, তা কখনও হয় ? নিশ্চয়ই আসবেন।"

আসল ব্যাপারটা হল, নিনির বুবুপিসি যে কলেজে ফিজিক্স পড়ায় সেই কলেজেরই বাংলার অধ্যাপক হচ্ছেন বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রশান্ত সেনগুপ্ত।

নিনি তো তাঁর বেজায় ভক্ত। ওঁর লেখার প্রত্যেকটা লাইন সে গড়গড় করে মুখস্থ বলে দিতে পারে। এমনিতেই নিনি গল্পের বইয়ের পোকা। অবশ্য পড়ার বইকেও সে মোটেই অবহেলা করে না। ক্লাসে বাংলার সেরা ছাত্রী সে। তাদের

বাংলার টিচার পম্পাদি তার লেখা রচনা অন্য সেকশনের মেয়েদেরও পড়ে শোনান। এমনকী স্কুলের ম্যাগাজিন কমিটিরও সে সম্পাদিকা। এহেন নিনি যখন শোনে যে প্রশান্ত সেনগুপ্ত তার বুবুপিসির সঙ্গে একই কলেজে পড়ান, তখন সে অজ্ঞান হয়ে যায় আর কি!

এদিকে বুবুপিসি আবার সাহিত্যের ধার ধারে না বিশেষ। সে এ-বাড়িতে এলেই নিনি জোঁকের মতো লেগে থাকে তার পেছনে। "বলো না বুবুপিসি, প্রশান্ত সেনগুপ্ত কী কী গল্প করেন তোমার সঙ্গে? ওঁকে স্টুডেন্টরা খুব ভালবাসেন, না গো?"

উত্তর দিতে দিতে তিতিবিরক্ত হয়ে গেছে বুবু। তাই সে এবার নিজেই নিনিকে বলে, "তুই যখন প্রশান্তবাবুর এতই ফ্যান, এ-বছর তোর জন্মদিনে ওঁকে এখানে নেমন্তন্ন করে নিয়ে আসব, দেখিস।"

নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারে না নিনি। উদ্‌ভ্রান্তের মতো প্রশ্ন করে, "আসবেন তিনি?"

খুব সহজভাবেই জবাব দেয় বুবুপিসি, "ওমা, আসবেন না কেন? দাঁড়া, আগে মেজদা-বউদি'র সঙ্গে কথা বলে নি, তারপর ব্যবস্থা করা যাবে।"

স্কুলে যারা নিনির খুব বেশি বন্ধু, তারাও প্রথমটায় বিশ্বাস করতে চায়নি। তাদের কাছে অবশ্য নিনি আগেই গল্প করেছে যে তার পিসির বিশেষ পরিচিত মানুষ হচ্ছেন প্রশান্ত সেনগুপ্ত। তবু, অরুন্ধতী, সংযুক্তা আর সোমা ঠোঁট উলটে বলেছিল, "দূর, অত বড় সাহিত্যিক অমন যেখানে-সেখানে ডাকলেই যান নাকি কখনও?"

তীব্র প্রতিবাদ করে নিনি, "তোরা কিছুই জানিস না, উনি ভীষণ ভাল মানুষ। বুবুপিসি নিজেই বলেছে। তা ছাড়া আমাদের বাড়িটা তো আর যেখান-সেখান নয়।"

এরপর বন্ধুরা একটু ঈর্ষামিশ্রিত কৌতূহল নিয়ে চুপ করে থেকেছে।

কাল কিন্তু ওরা নিজেরাই নিনিকে ঘিরে ধরেছিল, "দ্যাখ, নীলাঞ্জনা, প্রশান্ত সেনগুপ্ত তোদের বাড়িতে এলে তুই কিন্তু আমাদের জন্য অটোগ্রাফ নিয়ে রাখবি। ভুলিস না যেন।"

নিনি কাল সারাদিন উশখুশ করছিল পম্পাদিকেও খবরটা দেওয়ার জন্য। ছুটির পর টিচার্স রুমের কাছে এসে পম্পাদিকে সে যখন এই অসাধারণ ব্যাপারটা জানিয়েছিল, পম্পাদিও তখন রীতিমত চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "খুব ভাল কথা, তুমি ওঁর সঙ্গে কথা বললেও কত কী শিখতে পারবে। অগাধ পাণ্ডিত্য ওঁর, অত বড় শিশুসাহিত্যিক। আমরা সব কথা পরে শুনব'খন, কেমন?"

সারাদিন ধরে বসে বসে পড়ার টেবিল আর বইয়ের আলমারি খুব সুন্দর করে গুছিয়েছে নিনি। প্রশান্ত সেনগুপ্তর লেখা বইগুলো ইচ্ছে করেই আলমারির সামনের দিকে রেখেছে সে, যাতে উনি ঘরে ঢুকে বসলেই চোখ আপনা থেকে বইগুলোর দিকে চলে যায়। খাবার টেবিলেও ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে রাখল সে।

নিনির কাজের বহর দেখে বাড়ির সবাই মুখ টিপে-টিপে হাসছে। মুখে অবশ্য কেউ কিছুই বলছে না। কারণ ঠাকুমা সকালবেলাতেই সাবধান করে দিয়েছিলেন সবাইকে, 'আজ

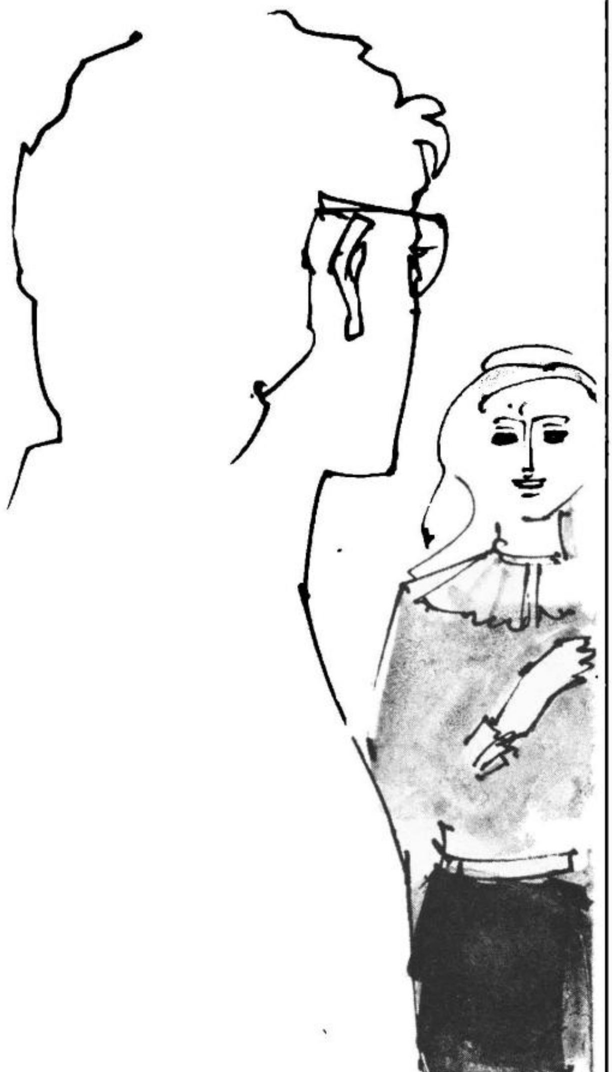

কিন্তু দিদুনকে কেউ খেপাবে না, কড়া কথাও বলবে না কেউ।' নিনি জানে এসব সতর্কবাণী বর্ষণ করা হয়েছে একজনেরই উদ্দেশে, আর সে হল কাকামণি।

সারাটা দুপুর নিনি শুধু এঘর-ওঘর করে বেড়াল। এত বড় দুপুর যেন কাটতেই চাইছে না। বড় দেরিতে ছুটি হয় বুবুপিসির!

বিকেলবেলা মা আর বাপির কিনে দেওয়া নতুন জামাটা পরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। অন্যদিন স্কুল থেকে ফিরে সে কোনওরকমে নাকেমুখে খাবার গুঁজেই ছাতে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে ছোটে; আজ আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না তার।

বিকেলের আলোও যখন প্রায় নিবে আসছে, বাপি আর কাকামণি ঘরে ফিরে এসেছে, নিনি ঘরে গিয়ে মা'র পাশে দাঁড়িয়ে প্রায় কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলে উঠল, "মা, বুবুপিসিরা বোধহয়—"

কথাটা শেষ করার আগেই বেজে উঠল কলিংবেল। এক লাফে নিনি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মাকে ফিসফিস করে বলে, "তুমিই দরজাটা খোলো মা।"

দরজা খুলতেই বুবুপিসির উচ্চকিত স্বর শোনা গেল, "কী রে, দেরি হয়ে গেল অনেক, না ? আসলে আমার তো আজ কমই ক্লাস ছিল, প্রশান্তদার ক্লাস শেষ হতে-হতেই প্রায় সন্ধে।"

সকলের পেছনে মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল নিনি। উত্তেজনায় তার হাত-টাত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। বাপি, মা আর কাকামণির সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ সেরে প্রশান্ত সেনগুপ্ত বসার ঘরে এসে বুবুপিসিকে বললেন, "কই অদিতি, তোমার ভাইঝি কোথায় ?"

নিনি এসে কোনওমতে পায়ে হাত দিয়ে ঝুপ করে প্রণাম করার পর প্রশান্ত সেনগুপ্ত তার হাতে উপহারের প্যাকেটটা ধরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, "কী নাম তোমার ?"

নিনি তার ভয়-ভয় ভাবটা তখন যথাসম্ভব কাটিয়ে স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করছে। প্রশান্তবাবু সোফায় বসে ওর দিকে তাকালেন, "বোসো খুকি।"

সেই মুহূর্তে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল নিনির। তার অমন সুন্দর একটা নাম থাকা সত্ত্বেও উনি কিনা 'খুকি' বলে ডাকলেন। পাশের চেয়ারে বসে সে। প্রশান্ত সেনগুপ্ত ওর দিকে আর বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে বাপি আর কাকামণির দিকে তাকালেন এবার। এ-কথা সে-কথার পর রাজনীতি নিয়ে জোর তর্ক শুরু হয়ে গেল ওঁদের মধ্যে।

নিনি আস্তে আস্তে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল। কেন যেন কিছুই ভাল লাগছে না তার। প্রশান্তবাবু একবারও বইয়ের আলমারির দিকে তাকালেন না তো। যাক্‌গে, খেয়াল করেননি হয়তো। একটু পরেই বুবুপিসি এসে হাজির। "কী রে, অন্ধকারে একা-একা দাঁড়িয়ে আসিছ যে ? চল, প্রশান্তদার সঙ্গে একটু কথা-টথা বলবি। যত বড় হচ্ছিস, তত গেঁয়ো ভূতের মতো স্বভাব হচ্ছে তোর !"

ওকে কোনও কথা বলতে না দিয়েই হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে হাজির করে বুবুপিসি। "এই যে প্রশান্তদা, ও আপনার লেখা পড়তে এত ভালবাসে, এখন কেমন পালিয়ে বেড়াচ্ছে।"

ঠাকুমা একটা মোড়ায় এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন, এবার আস্তে আস্তে বললেন, "আমাদের নিনি কিন্তু খুব ভাল গানও গায়।"

প্রশান্তবাবু স্নেহের হাসি হাসলেন, "তাই নাকি ? বাহ্‌, খুব ভাল কথা, খুব ভাল কথা।"

তারপরই বাপির দিকে ফিরে অ্যাশট্রেতে ছাই ঝেড়ে আবার বলতে লাগলেন, "বুঝলেন সন্তোষবাবু, এত অরাজকতা চলছে চারদিকে, দুর্নীতিতে ছেয়ে গেল দেশটা— ।"

নিনি উঠে পড়ল চেয়ার থেকে। মুখ কালো হয়ে গেছে তার। সে ভাবছে, 'আমার জন্মদিনের কথা কি কারও খেয়ালই নেই !'

খাবার জায়গা সাজিয়ে ফেলেছেন মা। এখন শুধুই প্রশান্তবাবু খেয়ে নেবেন। যদিও গাড়ি আছে সঙ্গে, তবু অনেকটা দূর, সেই বেহালায় ফিরতে হবে তো ওঁকে। নিনিকে টেবিলের পাশে ঘুরঘুর করতে দেখে মা বলে উঠলেন, "কী রে, তুইও খেয়ে নিবি নাকি এখন ?"

নিনি খসখসে গলায় জবাব দেয়, "না, আমার খিদে পায়নি।"

খাওয়ার আগে বিচ্ছিরি শব্দ করে বেসিনে হাত-মুখ ধুলেন প্রশান্ত সেনগুপ্ত। শিউরে ওঠে নিনি। খেতে বসে কড়মড় করে মাংসের হাড় চিবোতে চিবোতে আরামে চোখ বুজে ফেললেন তিনি ; তারপর বাজারদর নিয়ে আবার বড়দের মধ্যে কথা শুরু হয়ে গেল। একটু পরে মা যখন হাতায় করে মাংস নিয়ে এসেছেন, "না না ম্যাডাম, আমার আর কিছু লাগবে না," বলেই প্রশান্তবাবু এমনভাবে হাত নেড়ে উঠলেন যে টেবিলের ওপর রাখা ফুলদানিটা জল আর ফুলটুল সমেত উলটে পড়ে গেল।

সবাই মিলে হৈ-হৈ করে ওঠে, "এঃ হে, আপনার পাঞ্জাবিটা ভিজে যায়নি তো ?"

সবার আড়ালে ফুলদানিটা সরিয়ে রাখে নিনি।

প্রশান্ত সেনগুপ্ত যখন গাড়িতে গিয়ে উঠছেন বুবুপিসি আর নিনি ওঁকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল। নিনির যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না মোটেই, মায়ের চোখের নীরব ভর্ৎসনায় তাকেও বাধ্য হয়ে বুবুপিসির সঙ্গ নিতে হয়।

রাস্তাটার উলটো দিকেই একটা বস্তি, সেখানকার দু-চারটে ছোট ছেলেমেয়ে গাড়ির বনেটের উপর উঠে খেলা করছিল। তেড়ে গেলেন প্রশান্ত সেনগুপ্ত। "অ্যাই, নাম বলছি। মারব টেনে এক থাপ্পড়, বেয়াদপ ছেলে সব !"

তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে একটা বাচ্চা হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল। কাঁদতে কাঁদতে সে ছুটে গেল বস্তিটার দিকে। প্রশান্তবাবু গাড়িতে উঠে ওদের দিকে চেয়ে একগাল হেসে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলেন।

নিনির বুকের মধ্যে থেকে কেমন যেন একটা কান্নার স্রোত তিরতির করে ওপর দিকে উঠে আসছিল। কাঠের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখে গাড়ির পেছনের লাল আলো দুটো ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎই তার খেয়াল হল, বন্ধুদের জন্য অটোগ্রাফ নেওয়া হয়নি তো !

বাড়ি ফেরার সময় সারাক্ষণ বুবুপিসি বকবক করছিল। বাড়িতেও সবার মুখে প্রশান্তবাবুর আলোচনা।

মা বললেন, "কত তৃপ্তি করে খেলেন ভদ্রলোক।"

বাপি আর কাকামণি বলছিলেন, "সত্যি বুবু, কী অমায়িক ভদ্রলোক, ভাবাই যায় না !"

খাবার টেবিলে নিনির খোঁজ পড়ল। খুঁজতে খুঁজতে সবাই শোওয়ার ঘরে এসে দেখে বালিশে মুখ গুঁজে নিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অঝোরে কেঁদে চলেছে।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

গ্যেটে তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম 'ফাউস্ত' লিখেছিলেন প্রায় সারা জীবন ধরে। বইটির প্রথম খণ্ড লিখতে সময় লেগেছিল ত্রিশ বছর, আর দ্বিতীয় খণ্ড লিখতে তাঁকে ব্যয় করতে হয়েছিল পুরো পঁচিশটি বছর।

হঠাৎ একটি উড়ন্ত তীর এসে ওই কলকেটিকে উলটে ফেলে দিল…

খানসামা ও বিশে-ডাকাত

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

আমি যে-সময়ের কথা বলছি, তখন পিস্তল-পাইপগান, বোমা-পট্‌কা এ-সব আধুনিক হাতিয়ার ছিল না। ছিল লাঠি-শড়কি বল্লম-তীর। এ-সব হাতিয়াররকে সাথি করে বেরোত ডাকাতের দল। আর থাকত বড়-বড় মশাল। হাড়-কাঁপানো 'হা-রে-রে' চিৎকার। নিশুতি গভীর রাতে তারা যখন কোনও বাড়ি ঘিরে ফেলত, তখন সে-বাড়ির সক্কলের হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি লাগত, দাঁতে লাগত দাঁত-কপাটি।

জোড়াসাঁকোর বারাণসী ঘোষের ঠিক ওইরকম দাঁত-কপাটি লাগল। না, ওঁর বাড়ি কিন্তু ডাকাতেরা তখনও ঘিরে ফেলেনি। তবে ঘিরবে। ডাকাতি করবে। তারই সময় আর তারিখ জানিয়ে নোটিস পাঠিয়েছে বিশে-ডাকাত। ছোট একটি চিঠি। বার্তা আরও ছোট। কিন্তু ওই সংক্ষিপ্ত বার্তাতেই ঘোষমশায়ের হাড়ে কাঁপুনি ধরল।

অথচ ঘোষমশাই তেমন ভিতু লোক নন। বরং অনেক ব্যাপারে তাঁকে রীতিমত সাহসীই বলা যায়। চব্বিশ পরগনায় তিনি অনেকদিন ছিলেন। ওখানকার কালেকটার ছিলেন গ্লাডউইনসাহেব। সেই সাহেবের দেওয়ান ছিলেন এই বারাণসী। ভয় কাকে বলে তিনি জানতেন না। জোড়াসাঁকোর শান্তিরাম সিংহ সেইজন্যেই ওঁকে জামাই করেছিলেন। সার টমাস রম্‌বোলড্‌ আর মিডল্‌টনের অধীনে মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় দেওয়ানি করে সিংহমশাই টাকা করেছিলেন অঢেল। করেছিলেন ওড়িশায় বিরাট জমিদারি। জোড়াসাঁকোয় উনি থাকতেন। ওঁর বাড়ি তো নয়, রাজপ্রাসাদ। যাই হোক, জামাইকেও উনি টেনে আনলেন, জোড়াসাঁকোতে উঠল আরেকখানা প্রাসাদ। এই প্রাসাদে থাকতেন বারাণসী।

এখনও সেখানেই রয়েছেন। সুখী মানুষ। বারাণসী আরাম ভালবাসেন, তাই দাস-দাসী চাকরবাকর সকলে তাঁকে আরামে রাখতে চায়। আর বাবুর যে নিজস্ব খানসামাটি আছে, তার তো তুলনা হয় না। বাবুকে সে চোখে-চোখে রাখে। গড়গড়ার তামাক ফুরোতে-না-ফুরোতে সে নতুন সাজা কল্‌কে বাবুর গড়গড়ার মাথায় বসিয়ে দেয়। ঘোষমশাই তামাক খেয়েই চলেন, বুঝতে পারেন না কখন তামাক ফুরোয়। চৌকি থেকে নামতে-না-নামতে এইভাবেই ঘোষমশাই পায়ের তলায় চটি পেয়ে যান। গরমের দিনে বড় বড় পাখা নিয়ে সর্বদাই হাওয়া করে খানসামা। না, সত্যিই ছোকরাটির সেবার তুলনা হয় না। তবে মজার ব্যাপার এই, ঘোষমশাই ছোকরাটির নাম ভুলে গেছেন। মাঝে-মাঝে বলেও ফেলেন, 'খানসামা, তোমার নামটা একবার বলে ফ্যালো তো বাবু!'

ছোকরাটি মিটিমিটি হাসে। বলে, 'নামে দরকার কী রাজামশাই! আমাকে আপনি খানসামা বলেই ডাকবেন। আপনার সেরেস্তায় এই নামই আমার লেখা আছে।'

ঘোষমশাই গড়গড়ায় ভুড়ুক ভুড়ুক করে টান দেন এবং একটু পরেই অন্যমনস্ক হয়ে যান। সামনের বাগান থেকে একঝাঁক পাখি হঠাৎ পাখা ঝটপট করে উড়ে যায়।

কিন্তু ভাগ্যের কী পরিহাস, এই ভাবভোলা মানুষটির কাছেই কিনা এল ডাকাতের চিঠি। আর যে-সে ডাকাত নয়, একেবারে বিশে-ডাকাত। গড়গড়ায় টান দিতে দিতে ওঁর অনেক পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল। বেশি নয়, তিন পুরুষ আগের কথা। বারাণসীর ঠাকুরদা ছিলেন গণেশচন্দ্র। ওই গণেশচন্দ্রের অগ্রজ ছিলেন মনোহর ঘোষ। মহাদেবের মতো চেহারা। উনি খুবই কৃতী পুরুষ ছিলেন। ছিলেন রাজা টোডরমলের গোমস্তা। পরে মুহুরি। বাস করতেন অনেক

দূরে। সুবর্ণরেখা নদীর ধারে। মুঘল-পাঠানের যুদ্ধে বেচারি ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাই নিরাপত্তার প্রয়োজনে পালিয়ে আসেন চিতপুরে। এখানে এসে চিত্তেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই ! ডাকাতদের জ্বালায় উত্ত্যক্ত হয়ে তাঁকে তুলতে হল চিতপুরের বাস। তখন ডাকাতে এই পুরনো শহরটা থিকথিক করছে। চিতপুর-কাশীপুর মানেই ডাকাতের আড্ডা। তাই ওঁরা গিয়ে ব্যারাকপুরের পাশে চন্দনপুরে বাস করতে থাকলেন। বারাণসীরও শৈশব কেটেছে ওই চন্দনপুরে ! পরে নিজের উদ্যোগে এই জোড়াসাঁকোয় বাস।

এখন এই ডাকাতদের ভয়ে শেষ পর্যন্ত আমাকেও কি এই শহর ছাড়তে হবে ? বারাণসী সেদিন নিজেই নিজেকে এ প্রশ্ন করলেন। কিন্তু এর উত্তর তিনি নিজে দিতে পারলেন না। কেননা, জোড়াসাঁকোয় এ-বৈভব এ-আরাম ছেড়ে তিনি কোথায় যাবেন ?

এইভাবে ভাবতে ভাবতে তাঁর রাতের ঘুম চলে গেল। পর পর তিন রাত্তির তিনি ঘুমোতে পারলেন না। চোখ বসে গেল। খাওয়াও কমে গিয়ে একবারে সিকি হয়ে গেল। দাস-দাসী চাকরবাকর সকলেই উৎকণ্ঠিত। না, তিনি কাউকে কোনও কথা খুলেও বলতে পারেন না। কেমন যেন তিনি নিজেকে অসহায় বোধ করতে থাকলেন। মনে-মনে তিনি আকস্মিক দৈব কোনও ঘটনাকে যেন প্রার্থনা করে এই অসহায় ভাবটা কাটাতে চাইলেন।

চতুর্থ দিনের দিন দক্ষিণের বারান্দায় বসে যখন গড়গড়া টানছিলেন এবং তাঁর প্রিয় খানসামাটি পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, সেই সময় তাঁর নিজের জীবনে ঘটা একটা আশ্চর্য অলৌকিক ঘটনার কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। তখন উনি গ্লাডউইনসাহেবের দেওয়ান। যেমন সাহস, তেমনই প্রভাব-প্রতিপত্তি। সেবার চলেছেন কাশী। অর্থাৎ বারাণসী ঘোষ নিজেই চলেছেন বারাণসী। চলেছেন নদীপথে। দু'ধারে জঙ্গল। সেই জঙ্গলের ভেতর হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল এক ধ্যানী মহাপুরুষকে। উনি ধ্যানে অচৈতন্য। মাঝিরা ধরাধরি করে ওই অবস্থাতেই তাঁকে নৌকোয় তুলল। না, তাঁর জ্ঞান হল না। যেমন তোলা হয়েছিল, ঠিক সেই অবস্থাতেই উনি রইলেন। এদিকে নৌকো এগিয়ে চলল ভাসতে-ভাসতে। তবে ছাপঘাটের আগে বাদাবনের ভেতর ঢুকতে হল। কেননা, ছাপঘাটে সে সময় জল থাকবে না।

বারাণসী চোখ বুজলে আজও সেই বাদাবনের ভেতর দিয়ে নৌকোয় যাওয়ার ছবি দেখতে পান।

বাদাবনের ভেতর দিয়ে গুন টেনে নৌকোকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে মাঝিরা। খালেও জল কম। সবাই অন্যমনস্ক। এমন সময় জলের ধারে নৌকোয়-বসা মহাপুরুষের মতো অবিকল আরেক মহাপুরুষ দেখা দিলেন। ডাঙার মহাপুরুষ সোজা নৌকোয় চলে এলেন। নৌকোর ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষকে হাত ধরে টেনে তুলে দু'জনে চলে গেলেন জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে। বাদাবনের ভেতর দিয়ে কোথায় যেন চলে গেলেন। সবাই থ। পরে বারাণসী মাঝি আর লোকজনদের নিয়ে ওই বাদাবন তন্ন-তন্ন করে খুঁজলেন। না, কিছুই পাওয়া গেল না। এমন-কী কোনও সাধারণ একটা মানুষ পর্যন্ত না।

দক্ষিণের বারান্দায় বসে পুরনো দিনের সেই স্মৃতিতে রোমাঞ্চিত হলেন বারাণসী। তবে সঙ্গে-সঙ্গে তিনি খুব বিমর্ষ হলেন বিশে-ডাকাতের কথা ভেবে।

খানসামা পা টিপতে টিপতে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার রাজামশাই, এত ভাবছেন কী বলুন তো ?"

রাজামশাই চমকে উঠে বলে উঠলেন, "না, না, কিছু ভাবিনি তো," তারপর যেন খুব লজ্জা পেয়ে বললেন, "আরে, আমি ভাবছি নাকি ?"

"ভাবছেন না ? দিনরাত ভাবছেন, ভাবতে-ভাবতে আপনার খাওয়াদাওয়া উঠে গেল, ঘুম উবে গেল, দিনরাত কেমন যেন অন্যমনস্ক, তবু বলছেন যে ভাবছি না," খানসামা এবার বারাণসীর পা দুটো জাপটে ধরে বলল, "বলুন তো রাজামশাই, কী হয়েছে, যদি কিছু করবার সাধ্যি থাকে, একবারে জীবন লড়িয়ে দেব !"

খানসামার কথাগুলি খুবই আন্তরিক ছিল। ঘোষমশায়ের মন গলে গেল মুহূর্তে। মনে হল, তিনি যেন দৈব আশ্বাস শুনছেন। বাদাবনের ভেতর দিয়ে নৌকো চলেছে ছাপঘাটের দিকে। আর সেই নৌকোয়-বসা মহাপুরুষ এবং ডাঙার মহাপুরুষ দু'জনে এক হয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করছেন।

বলা বাহুল্য, সেই পড়ন্ত দুপুরে খানসামাকে রাজামশাই তাঁর সব কথা বলে ফেললেন। বিশে-ডাকাত যে কী ভয়ঙ্কর, সে কথা মনে করিয়ে দিতে ভুললেন না।

খানসামা মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বলল, "ঠিক আছে রাজামশাই, বিশে-ডাকাতকে কী রকম বেকায়দায় পড়তে হয়, একবার দেখবেন।"

এরপরে চলল প্রস্তুতির পালা। সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিটির জন্য অপেক্ষা।

দুপুরের পরে বাড়ির বাইরের মহল থেকে খানসামা সকলকে ভেতরের মহলে পাঠিয়ে দিল। বলল, "না কেউ থাকবে না।" ভোজপুরি দরোয়ানেরা থাকতে চেয়েছিল। আরও অনেকে গোঁফে তা দিয়েছিল, বড়-বড় লাঠিতে তেল মাখিয়েছিল, কিন্তু খানসামা কাউকেই সে-সন্ধ্যায় বাইরের মহলে আসতে দিল না। বাইরের সিংহ-দরজা খোলা রেখে সে একটু আড়ালে রইল গা-ঢাকা দিয়ে। বাইরের মহল রইল একেবারে ফাঁকা।

এদিকে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত। রাজবাড়িতে রাত আগে গভীর হতে থাকল। সব সুনসান। মাঝে-মাঝে এক-আধবার প্যাঁচার ডাক কেমন যেন ভয় পাইয়ে দিচ্ছিল। তারপর আবার নীরবতা।

ওই নীরবতাকে হঠাৎ যেন বোমার শব্দে ফাটিয়ে দিয়ে হাজার মশালধারী লোক রাজবাড়ির দরজার সামনে মাটি ফুঁড়ে উঠে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে সেই পিলে-ফাটানো হা-রে-রে চিৎকার। লেঠেলরা লাঠিখেলা আরম্ভ করে দিল। মারতে থাকল মালশাট। খটাখট শব্দে কানে লাগল তালা।

স্বয়ং বিশে অবশ্য একটু পরে এল পালকি চড়ে। এসে দেখল তার দলবল আসর জাঁকিয়ে ঘোষমশায়ের সদর-দরজা দখল করে বসে আছে। তবে দরজা খোলা। একবারে হাট করে খোলা। বাড়ির লোক বেপাত্তা। দরজা খোলা কেন ? বিশে-ডাকাতের ভ্রূ কুঞ্চিত হল, "বাড়ির লোকজনই বা গেল কোথায় ?" বিশে পরিস্থিতিটা বোঝবার চেষ্টা করল।

পালকিতে আধশোয়া হয়ে বসে ছিল বিশে। পালকির দরজা দুটো বন্ধই ছিল। শুধু একটুখানি ফাঁক। সেই ফাঁক

দিয়েই বাইরের দিকে নজর রাখছিল বিশে। আর তারই একটু পাশে বসানো ছিল আলবোলা। মনটা অস্থির হওয়াতে একটু তামাক খেতে ইচ্ছে হল বিশের। ইচ্ছের সঙ্গে-সঙ্গে হুকুম। আর হুকুম হওয়ামাত্র সাজা কলকে এসে বসল আলবোলার ওপর।

কিন্তু ওই বসাটুকুও কেউ যেন সহ্য করল না। হঠাৎ অন্ধকারের ভেতর থেকে একটি উড়ন্ত তীর এসে ওই কলকেটিকে উলটে ফেলে দিল। পরে ওই তীরটি গেঁথে গেল পালকির গায়ে।

বিশে অবাক। হতবাকও। তবে এই রকম যে কিছু হতে চলেছে, সে রকম একটি আন্দাজ তার হচ্ছিল। হতবাক হলেও মুহূর্তে সব ব্যাপার সে বুঝে ফেলল। খুব চাপা গলায় সে আরেক শাগরেদকে বলল, "নতুন করে আরেকটা কলকে সেজে আলবোলার মাথায় চাপিয়ে দে তো।" আর মনে মনে বলল, 'এবার বোঝা যাবে তুমি সত্যিকারের তীরন্দাজ কি না! তুমি লক্ষ করে এটি কেটে দিলে, না হঠাৎ হয়ে গেছে, এবার সেটা বোঝা যাবে বাপু।'

কলকে আবার বসল আলবোলার মাথায়, আর সঙ্গে-সঙ্গে সেটিও উড়ন্ত তীরের আঘাতে উলটে পড়ল। আর তীরটি পালকির গায়ে বিদ্ধ হয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকল। উত্তেজনায় বিশে উঠে বসল।

না, এই সাফল্যের তারিফ না-করে বিশে আর থাকতে পারল না। সে লাফিয়ে নামল পালকি থেকে। এক ধমকে থামিয়ে দিল তার দলের মশালধারী আর লেঠেলদের। চারদিকে এমন নীরবতা নেমে এল যে একটি ছুঁচ পড়লেও যেন শব্দ হয়!

সেই নিশুতি রাতে গম্ভীর গলায় বিশে বক্তৃতার ঢঙে বলল, "ভাই তীরন্দাজ, তোমাকেও অজস্র ধন্যবাদ। তুমি বেরিয়ে এসো। তোমার সঙ্গে আলাপ করব।"

রাজবাড়ির বাইরের মহল যেমন নীরব ছিল, সেরকমই রইল। বেরিয়ে আসতে কেউ যেন সাহস করল না। বিশে-ডাকাত তাই আরও উদাত্ত স্বরে তার আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করল, "ভয় নেই ভাই, কোনও ভয় নেই। এমন তীরন্দাজ যে-বাড়িতে আছে, সে-বাড়িতে আমি কখনও ডাকাতি করি না। ভাই তীরন্দাজ, কোনও ভয় নেই, তুমি বেরিয়ে এসো।"

বেরিয়ে এল সেই তীরন্দাজ। না, সেই ব্যক্তিটি অচেনা কেউ নয়। সে হল, সেই খানসামা। বারাণসীবাবুর আদরের খানসামা। ডাকাত বিশে তাকে জড়িয়ে ধরল বুকে। বলল, "চিন্তা নেই ভাই, কথা দিলাম এ-বাড়িতে কখনও ডাকাতি হবে না। আর তা হল তোমার তীরন্দাজির পুরস্কার।"

পরে বারাণসীবাবুও খুব খুশি হলেন। তিনিও অনেক পুরস্কার দিলেন তাঁর খানসামাকে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তিনি তার আসল নামটা মনে করতে পারলেন না। খানসামা একগাল হেসে বলল, "তাতে কী হয়েছে? আপনি আমাকে 'খানসামা' বলেই মনে রাখুন। এটাই হবে আমার সব থেকে বড় পুরস্কার রাজামশাই।"

বারাণসী বললেন, "তথাস্তু।"

ছবি : প্রবীর সেন

ডাক্তারবাবু বলছেন

শীতের খাবার

শীতকালে আমাদের দেশে শাকসব্‌জির অভাব নেই। আলু কপি থেকে শুরু করে পালংশাক অবধি সবই পাওয়া যায় বাজারে, আর এর প্রত্যেকটিই শরীরের পক্ষে উপকারী। অনেকের ধারণা, বেশি করে মাছ মাংস ডিম খেলেই শরীর ভাল হয়। এ ধারণা ঠিক নয়। পেট ভরে নিরামিষ খাবার খেলেও শরীর ভাল থাকে। বাড়িতে যা জোটে তাই পেট ভরে সময়মতো খেলে শরীর খুব ভাল হয়।

সকালবেলায় উঠে ব্যায়াম করে বা একপাক দৌড়ে এসে জলখাবার খাবে। হাতে-করা রুটি, ভাল গুড় আর আলুসেদ্ধ খেলেই শরীর তাজা হয়ে উঠবে, যদি একটু মোটা হবার ইচ্ছে থাকে, তা হলে রোজ সকালবেলায় জলখাবারের সঙ্গে একমুঠো চিনেবাদাম খেলেই হবে।

দুপুরবেলায় স্কুল-কলেজে যাবার আগে ভাত বা রুটির সঙ্গে ডাল, পালংশাকের তরকারি, মাছ-মাংস-ডিমের যে-কোনও একটা অথবা নিরামিষ আলু-কপির তরকারি খেতে পারো। বিকেলে গুড় দিয়ে রুটি খাবে। চিনির চেয়ে গুড়, বিশেষ করে আখের গুড়, শরীরের পক্ষে বেশি উপকারী। রাত্রে রুটি খাওয়াই ভাল। রুটির সঙ্গে ডাল-তরকারি আর যা হোক খাবে। যা হোক মানে ডিম মাছ বা মাংস যা বাড়িতে পাবে, খাবে। রাত্রে এক গ্লাস দুধ খেলে শরীর ভাল থাকবে আর সকালবেলায় কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

শীতকালে অনেক ফল পাওয়া যায়। পাকা ফল খেলে শরীর ভাল থাকবে আর গায়ে জোর হবে। পাকা ফল মানে যে আপেল ন্যাশপাতি খেতে হবে তার কোনও মানে নেই, পাকা কলা খেলেও শরীর ভাল থাকবে। তবে ফল যদি খাও, আস্ত ফল কিনে আনবে, বাড়িতে ভাল করে ধুয়ে কেটে খাবে। খানিকটা আজ খেয়ে বাকিটা কাল খাব, এ-অভ্যেস ছেড়ে দিতে হবে। যতটা কাটবে, ভাই-বোন সবাই মিলে সবটা খেয়ে নেবে, পরের দিনের জন্যে রেখে দেবে না। টিফিনে যদি ফল নিয়ে যাও, আস্ত ফল ধুয়ে নিয়ে যাবে, আর সেই ফল চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে। যতটা পারবে খাবে, বাকিটা ফেলে দেবে। আপেল খেলে বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে, কারণ আপেলের মধ্যে খুব বাতাস থাকে। চিবিয়ে না খেয়ে যদি গিলে খাও, তা হলে আপেলের বড় টুকরো পেটের মধ্যে চলে যাবে আর সেই টুকরোর সঙ্গে বাতাসও খেয়ে ফেলবে। একে বলা হয় এয়ারোফেজিয়া। পেটে বায়ু ভরতি হয়ে গেলে পেট ফুলে উঠবে, কিছু খেতে পারবে না।

যারা রোগা হতে চাও, তারা শসা খেতে পারো। শসায় তেমন কোনও পুষ্টিকর পদার্থ নেই, অথচ খেলে পেট ভরতি হয়ে যায়। সেইজন্য যারা রোগা হতে চায়, তারা শসা মুলো মানে স্যালাড খাবার আগে খায়, তাতে পেটও ভরে যায়, আর বেশি খাওয়াও যায় না।

(ডাঃ) বিশ্বনাথ রায়

খড়্গনাসা সুবুদ্ধি

আনন্দ বাগচী

লেজ-গোবরে ক্লাউন ভেবে খড়্গনাসা সুবুদ্ধিকে
সবাই হাসে, হাততালি দেয়, ভিড় জমে যায় চতুর্দিকে।
সবাই ভাবে গোঁফ ওঠেনি, মিহিন গলা, পাঁচফুটিয়া
বাঁটুল কিশোর, গোলপানা মুখ, প্যাটার্নখানা প্রায় ভুটিয়া।
মালাইচাকির মুণ্ডি ছুঁয়ে ম্যাক্সি-কামিজ, তার নীচে কী?
সেরেফ দেখেই ভয় পেয়েছ? বলছি শোনো গবেট ঢেঁকি,
হোল্ডলও না, ট্রাউজারও না, পেন্টুলুনের শেষ প্রজাতি,
খান-একুশেক পকেট তাঁতে, গর্বে যেন ফোলায় ছাতি!

জ্যান্ত পকেট, আজগুবি না, বেজি এবং কাঠবেড়ালি
দিচ্ছে উঁকি দুই পকেটে, অন্যগুলোয় পাঁচমেশালি
টাইমটেবল, চাবির গোছা, মোমবাতি আর গালার মোহর,
আড়াই ডজন হরেক জিনিস, জ্ঞান ফেরানোর, জ্ঞান হারানোর
তরল কিছু, গায়ের চামড়া গিলে করার আজব মলম,
আতশ, ফিতে, অ্যালার্ম ঘড়ি, ভ্যানিশকালির ঝরনা-কলম,
এক পকেটে চোখের ধুলো, পরচুলা আর গামের শিশি।
কেউ ভাবে এ ভোজবাজি সঙ, কেউ বা ভাবে এ সন্ন্যিসি!
খানিক ধাঁধা খানিক ধোঁকা, সব মিলিয়ে গোলমেলে চিজ,
এই মাটিতে নামিয়ে গেছে গ্রহান্তরের প্যায়লা-পিরিচ?

ছদ্মবেশী খড়্গনাসার দিন চলে যায় ব্যস্ত বেজায়,
সবার দিকেই তীক্ষ্ণ নজর কেমন পায়ে কে হেঁটে যায়!
আড় চোখে চান, ট্যার চোখে চান, পিছু হটেন, পিছু হাঁটেন,
ঝড়ের বেগে নোট লিখে যান, অঙ্ক কষেন, অঙ্ক কাটেন।
মানসাঙ্ক মানুষাঙ্ক দুই তরফের জটিল পাকে
মুখ্যুরা তো চিনল না কেউ এই আধুনিক গোয়েন্দাকে।

ছবি : দেবাশিস দেব

ডাইনোসরের প্রবেশ প্রস্থান

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সবচেয়ে বেশি ঢ্যাঙা কে ? এই নিয়ে সেকাল আর একালের চতুষ্পদ প্রাণীদের মধ্যে যদি বাজি ধরা হয়, তা হলে জিতবে কে ? একদল সরীসৃপ। আর এই বিরাটকায় প্রাণীদের নাম ডাইনোসর। 'ডাইনো' মানে ভয়ঙ্কর বা দারুণ। এক কথায়, দারুণ সরীসৃপ। সাড়ে বারো কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে এরা একচ্ছত্র হয়ে রাজত্ব করেছে।

এদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা ছিল ডিপ্লোডোকাস। এরা গাছগাছড়া খেত। লম্বায় ছিল সাতাশি ফুট। ছোটখাটো একটা জাহাজের মতো এত প্রকাণ্ড যার দেহ, তার মুণ্ডুটা ছিল কত বড় ? শুনে সবাই হাসবে। তার মাথাটা ছিল ঠিক একটা মুরগির ডিমের মতো। এমন যার মাথা, সে যে মোটেই করিৎকর্মা হবে না, এ তো জানা কথাই।

বার্ট টেলর নামে এক সাংবাদিক ডিপ্লোডোকাসকে নিয়ে একটা মজার পদ্য লিখেছিলেন :

এ সেই পরাক্রান্ত ডাইনোসর
যার ছবি আঁকা প্রাক্‌পুরাণিক পটে,
শুধুই গায়ের জোরে নয় খ্যাতি তার
বুদ্ধিতেও সে বৃহস্পতিই বটে।
দ্যাখো, তার শেষ হাড়কঙ্কালটাকে—
শাঁসালো মগজ ছিল তার একজোড়া ;
একটি আগায় (যেখানে মগজ থাকে),
একটি যেখানে মেরুদণ্ডের গোড়া।
তাই যতসব কঠিন কঠিন ধাঁধা
আগাগোড়া তার বুঝতে হয়নি বাধা।

সব মেরুদণ্ডী প্রাণীরই কোমরের নীচের দিকটা মোটা। যেখান থেকে পায়ের দিকের স্নায়ু শুরু হয়। গোদা-পা ডিপ্লোডোকাস ছিল আবার একটু বেশিরকম পেছনভারী। সেখানে তার মগজ না থাকলেও (তার মাথাতেই বা কী মগজ ছিল ?), টেলর তার দুটো মগজ নিয়ে ঠাট্টা করেছেন।

ডাইনোসরদের মধ্যে সবচেয়ে মোটা ছিল ব্রাকিওসরাস। তার ওজন ছিল পঞ্চাশ টন। বেঁচে থাকলে আজ যে-কোনও দোতলা বাড়ির ছাদের ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে সে গলা বাড়াতে পারত।

এই দু'দলই থাকত জলা জায়গায়, আর সমুদ্রের কাছাকাছি লোনা বিলে। দেহের প্রচণ্ড ভার বইবার দিক থেকে জলে থাকাটাই তাদের পক্ষে সুবিধের ছিল।

ডাইনোসরদের মধ্যে সবচেয়ে শয়তান ছিল টিরানোসর। এর মতো অতিকায় মাংসাশী প্রাণী পৃথিবীতে আর হয়নি। মাথায় উনিশ ফুট। ধারালো ভোজালির মতো ছ' ইঞ্চি লম্বা দাঁত। শিকারে বেরোলে তাকে দেখে বড়-বড় শিংওলা ডাইনোসররা পর্যন্ত ভয়ে ছুটে পালাত।

মোটা অথর্ব ডাইনোসরদের অনেকেরই শরীরে ছিল আত্মরক্ষার নানা উপায়। স্টেগোসরাসের পিঠ ছিল একপ্রস্থ মোটা শক্ত হাড় দিয়ে মোড়া আর লম্বা লেজে ছিল দু' জোড়া ধারালো খড়্গ। অ্যাঙ্কিলোসরদের সারা গায়ে মালার মতন এত বেশি হাড় উঁচিয়ে থাকত যে, তাদের দেখাত ঠিক একালের যুদ্ধের ট্যাঙ্কের মতো। এদের তাই আরেক নাম ট্যাঙ্ক-ডাইনোসর। অন্য ডাইনোসরদের নাকে থাকত একালের গণ্ডারদের মতো শিং কিংবা গলার চারদিকে শক্ত হাড়ের বর্ম।

টিরানোসর ছিল এদের সবার কাছেই সাক্ষাৎ-যম।

এত যে প্রবল পরাক্রান্ত ডাইনোসর, একদিন তাদেরও ঝাড়েবংশে বিদায় নিতে হল।

পৃথিবী আরেকবার তোলপাড় হল পাঁচ কোটি নব্বুই লক্ষ বছর আগে। খালবিল শুকিয়ে গেল। মাথা চাড়া দিয়ে উঠল পাহাড়-পর্বত। উত্তর থেকে ভেসে এল নির্জলা ঠাণ্ডা বাতাস। গ্রীষ্মমণ্ডলের সব সরস গাছপালা উজাড় হয়ে গেল।

জলা জায়গার হাওয়া ছিল গরম আর ভিজে ; খাবার জিনিসও সহজে পাওয়া যেত। কাজেই ডাইনোসররা বেশ বহালতবিয়তেই ছিল।

কিন্তু শুকনো শিলাময় পার্বত্য ঢালু জায়গায় ডাইনোসরদের টিকে থাকা আর সম্ভব হল না। নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে এইভাবে ডাইনোসরদের যুগ শেষ হল।

ক্রমবিকাশের ধারায় তৈরি হল আরও একটা কানাগলি।

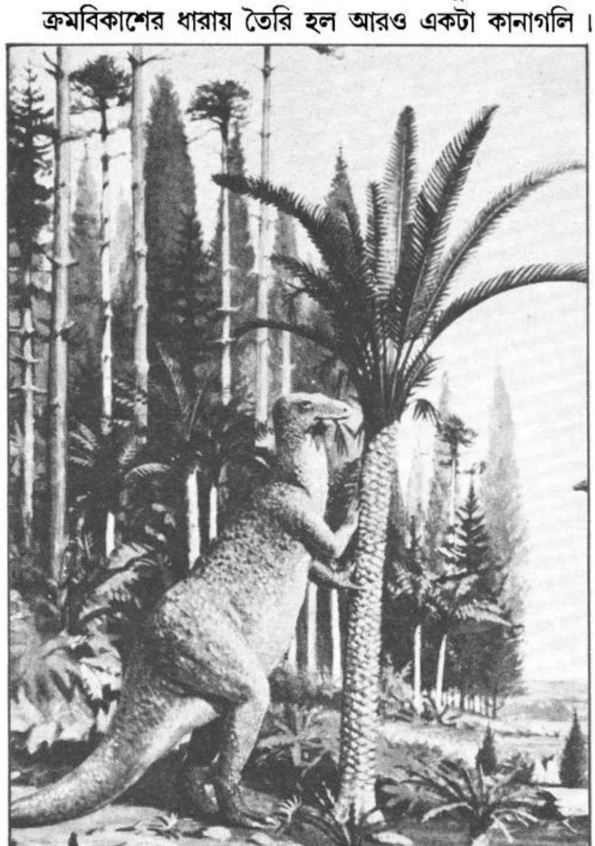

জাহাজে তোমাদের মক্কায় পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারি, কিন্তু তার ব্যবস্থা করতে দিন দুই-তিন সময় তো লাগবে।
তা লাগুক।
বাব এল আরকে খবরটা দিতে হচ্ছে···
ঘ্রাআআউ !
আবার কী হল ?
বেন ইউসুফ আয়েশার লেজ মাড়িয়ে দিয়েছিল, তাই আয়েশা ওকে কামড়ে দিয়েছে ! সেরে উঠতে এখন হপ্তা-তিনেক লাগবে।
আহা, বেচারা !
তিন দিন পরে···
দু'জন লোক দিচ্ছি। তাদের সঙ্গে সমুদ্রের ধারে চলে যাও। সেখানে একটা পালের জাহাজ থাকবে। তাতেই মক্কায় যাবে তোমরা। তবে হ্যাঁ, গর্গনজোলা সাংঘাতিক লোক, তাই সাবধান থেকো !
আরও দু'দিন পরে···
এসে গেছি। কিন্তু দাঁড়াও, জাহাজটা আছে কি না দেখে নিই।
লোকটা ডাকছে আমাদের।
জাহাজ না ছাই, এ তো একটা বজরা !
একটা ডিঙি আসছে !
হুঁশিয়ার ! পাহারাদার ! হুঁশিয়ার !

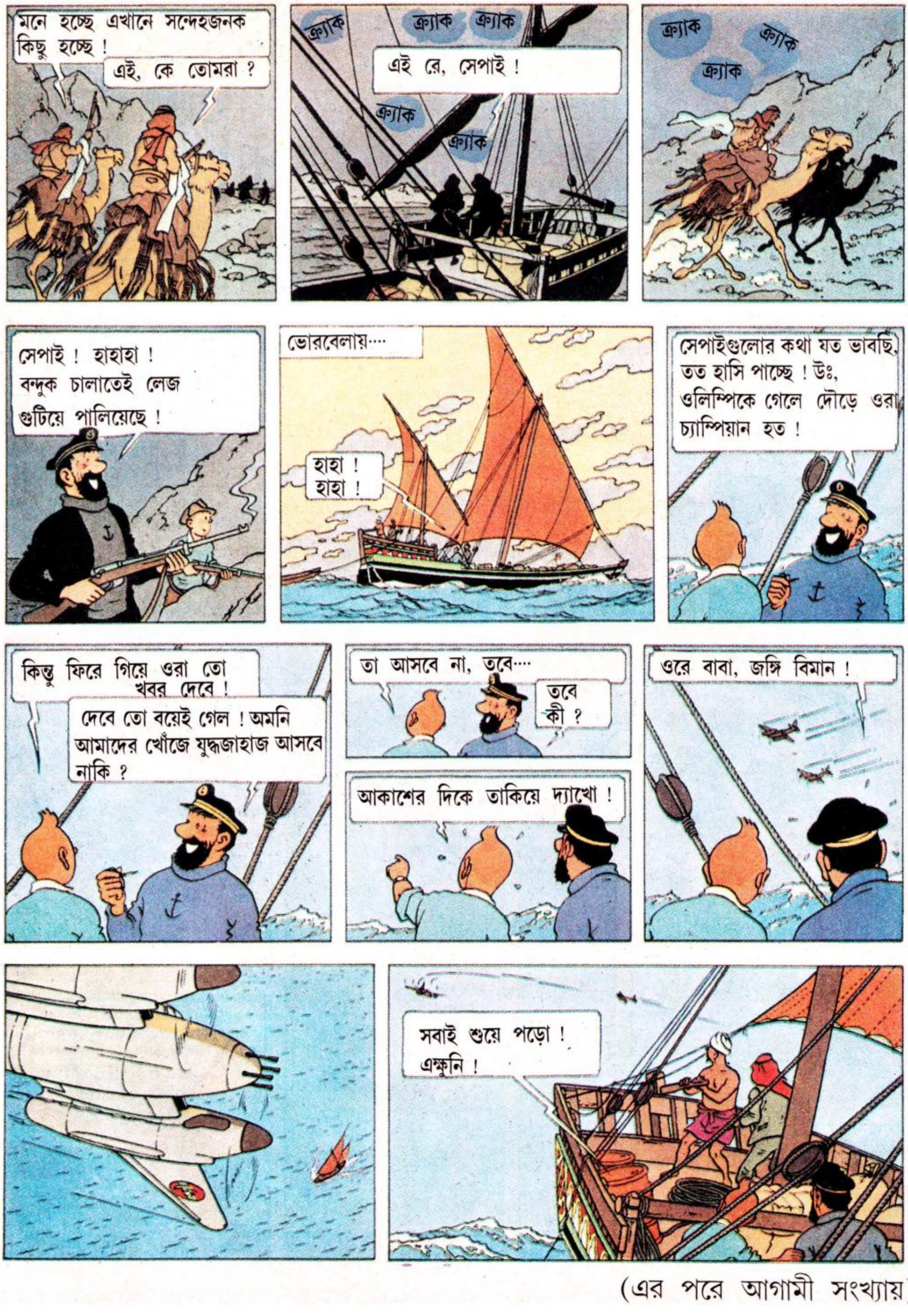

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
রোভার্সের চেয়ারম্যান স্যাম বার্লোকেও শুনতে হচ্ছে কটূক্তি···
গাইলস আর ডিক্সনকে বেচতে দিয়ে বোকামি করেছ !
কে নেবে ওদের জায়গা ?
ROVERS
খেলা ফের শুরু হল···
রয়, প্রমাণ করো যে, ওদের বেচে ভুল করোনি !
রয়কে বল দিতে চাইছে প্যাকো···
প্যাকো, ওয়ান-টু করে এগোও !
নাও, ক্যাপ্টেন !
প্যাকো চমৎকার বল দিয়েছে !
বিদ্যুৎ-বেগে এগিয়ে বল ধরল রয় ···এবং গোল !
জাল ছিঁড়ে যায়নি তো !
আধ মিনিটে গোল শোধ !
দারুণ পাস দিয়েছিলে প্যাকো !
আরও দেব !
RACEY!
ROVERS
স্ট্যামব্রিজ আবার হানা দিয়েছে···
চার্লি ও-বল ধরে নেবে !
ধরো, চার্লি !
বল না-ধরে চার্লি শুট করতে গেল···
যাঃ !
যাচ্ছলে, স্ট্রাইকারের গায়ে লেগেছে !

গায়ে লেগে গোলে ঢুকল !
ধুত্, চার্লি এ কী করল !
ভিক্ গাথ্‌রি নিজেকে আর সামলাতে পারল না…
তুমি কি ওদের হয়ে খেলছ নাকি চার্লি ?
থামো ভিক ! ওকে কিছু বোলো না !
ওভাবে বললে চার্লি তো আরও নার্ভাস হয়ে যাবে !
ঠিক কথা, তুমিই ওদের আটকাও !
ভিক্ আজ দারুণ খেলছে ।
নননাঃ !
ভিক্ জোর আটকে দিল !
বল রয়ের পায়ে !
গোল ! রয় ফের গোল দিয়েছে ।
আঃ, গোলের মতো গোল ।
মেলচেস্টার রোভার্স ২
স্ট্যামব্রিজ সিটি ২
এবারে সবাই জান লড়িয়ে খেলে যাও !
কিন্তু চার্লির অবস্থা দেখেছ ?
শোচনীয় !
ভীষণ নার্ভাস হয়ে গেছে !
এই অবস্থায় স্ট্যামব্রিজ হানা দিলেই গোল হবে !
কী হবে শেষপর্যন্ত এই ম্যাচের ফল ?
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

সুমীত ব্যবহারে বহুবিধ সুবিধে

এই মেশিনের সব কাজ তার প্রাণকেন্দ্র থেকে উদ্ভাবিত

এর হেভী ডিউটি মোটর না থেমে ৩০ মিনিট চলতে পারে।
বিশেষ ডিজাইনে তৈরী চারটি ব্লেড ও অল্প পরিমাণ পেষাই করার ক্যাপযুক্ত
এই সুমীত ডোমেস্টিক কিচেন মেশিন কত সহজে রান্নার
মূল সরঞ্জাম বানিয়ে দেয়।

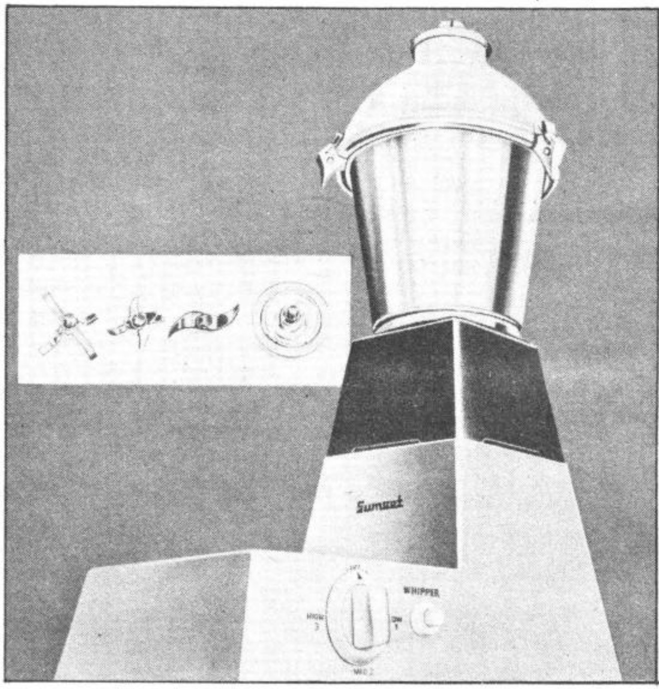

লঙ্কা আর গরম মশলা
২ মিনিটে শুকনো পেষাই।

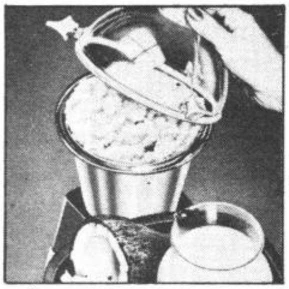

কড়াই ডাল, চাল ও নারকোলের
শাঁস ২ মিনিটে ভিজে পেষাই।

মাংস কিমা করে ১ মিনিটে আর
গাজর, পেঁয়াজ, নারকোল ও বাদাম
কুরে দেয়…কয়েক সেকেণ্ডে।

লস্যি, দুধ আর ডিমের সাদা
অংশ ফেটায় ১ মিনিটে।

এখন যোগ হ'ল সুমীত ফুড প্রসেসর অ্যাটাচমেণ্ট

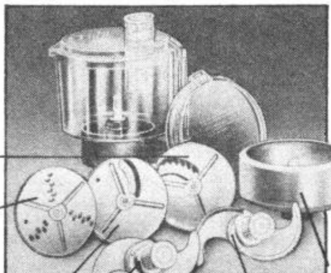

সুমীত আপনাকে দিচ্ছে আর একটা বিশেষ সুবিধে—নতুন ঐচ্ছিক ফুড প্রসেসর অ্যাটাচমেণ্ট লাগিয়ে আপনি অনেক কিছুই করতে পারবেন! এতে আছে স্বচ্ছ অথচ ভাঙ্গে না এমন একটি ৩.৮৮ লিটারের পাত্র, ৫টি বদলযোগ্য ব্লেড ও ডিস্ক আর রস করবার যন্ত্র। এই অ্যাটাচমেণ্টটি আপনি আপনার সুমীত ডোমেস্টিক বেসিক ইউনিটে লাগিয়ে দিন, ব্যস্, আর দেখুন কী বিস্ময় সৃষ্টি করে!

সুমীত®

৪০০ ওয়াট ২২০-২৪০ ভোল্ট~ ৩০ মিনিট রেটিং

শক্তপোক্ত রান্নার ঝক্কি সামলাতে শক্তপোক্ত ভাবে তৈরী।

আমাদের বিনামূল্যে প্রদর্শনী দেখার অপেক্ষায় থাকুন আর সুমীত আপনার কি কি কাজ কি ভাবে করছে—চাক্ষুস দেখুন।

সার্ভিস সেণ্টার:

কলকাতা: কে দত্তপানি অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রা. লি, ৫৫, এজরা স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০১ ফোন: ২৬৬৭২৮/২৯। সুমীত সার্ভিস সেণ্টার (দক্ষিণ) পি-৪৯৮ কেয়াতলা রোড, দু'তলা, কলকাতা-৭০০ ০২৯ ফোন: ৪৬৬১১৬। **গৌহাটী:** এইচ. ভি. ট্রেডার্স, ডুগার বিল্ডিং, ফ্যান্সী বাজার, গৌহাটী, আসাম-৭৮১০০১ ফোন: ২৮০২৮

OBM/3187 BEN

দুই বেচারা

প্রবাল দত্ত

একদিন একটা ছাগল আর একটা বাঁদরের খুব ঝগড়া হল।
"অসম্ভব," ছাগল বলে।

বাঁদর বলল, "কেন অসম্ভব।"

"হয় না।"

"কে বলেছে হয় না ?"

ব্যস, লেগে গেল চুলোচুলি, চুলোচুলি থেকে হাতাহাতি। তারপর দুজনেই হাঁফিয়ে পড়ে থামল। বাঁদর বলল, "বেশ, এক ডজন পাকা কলা বাজি রাখ। দ্যাখ, আমি বলতে পারি কি না।"

"আর যদি বলতে না পারিস," ছাগল জিজ্ঞেস করল।

বাঁদর বলল, "তা হলে তোকে নদীর ওপার থেকে একবোঝা কচি ঘাস এনে খাওয়াব।"

ছাগল বলল, "যদি না আনিস তোকে ফের মুখপোড়া বলব।"

ছাগল চলে গেল, বাঁদরও চলে গেল।

সারাদিনের পরে বটগাছের তলায় দুজনে আবার হাজির। দু' এক কথা হতে হতেই শুরু হয়ে গেল ঝগড়া। বাঁদর লাফিয়ে লাফিয়ে বলল, "এক হাজার সাতশো তিপ্পান্নখানা ঢেউ এসেছে নদীতে, সকাল থেকে বসে আমি গুনেছি।"

ছাগল বলল, "মিথ্যে কথা, সারাদিন ধরে আমি দেখেছি তুই ওই নদীর ঘাটে এর ওর পেছনে লাগছিস, কখন গুনলি ?"

তিড়িং করে লাফিয়ে গাছে উঠে পড়ল বাঁদর। তারপর একটা লাঠি নামিয়ে এনে বলল "এই লাঠিটা তবে কী ? একটা করে ঢেউ গেছে, আর লাঠির গায়ে জলের দাগ পড়েছে। এই দ্যাখ, এখনও জলে ভেজা।"

ছাগলের সেই এক কথা, "গুনিসনি, নদীর ঢেউ গোনা যায় না।"

মারামারি হতে যাচ্ছিল। শেয়াল-পণ্ডিত এসে পড়তেই থেমে গেল ব্যাপারটা। সবাই মিলে চলল শেয়াল-পণ্ডিতের বাড়ি।

শেয়াল-পণ্ডিতের বাড়ি পুকুরধারে। বেশ সাজানো-গোছানো। সামনে আবার নোটিস বোর্ড ঝুলছে, 'কুকুর হইতে সাবধান।' কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, পণ্ডিত গম্ভীর স্বরে বলে, "ওসব তোমরা বুঝবে না, ওগুলো লাগাতে হয়।" যাক্‌গে সেসব কথা, শিয়াল-পণ্ডিতের পসার বিরাট, এধার-ওধার থেকে পেঁচা, ইঁদুর, খরগোশেরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে আসে। সব শুনেটুনে পণ্ডিত যা মতামত দেয় তাই মেনে নেয় সবাই।

ছাগল আর বাঁদরের ঘটনাও শিয়াল-পণ্ডিত শুনল। তারপর বলল, "ব্যাপারটা খুবই জটিল। বাঁদর বলছে সকাল থেকে লাঠি ডুবিয়ে নদীর ঢেউ গুনেছে। ছাগল বলছে ও সারাদিন ধরে বাঁদরকে এর পিছনে ওর পিছনে জ্বালাতন করতে দেখেছে।" অনেক ভেবেচিন্তে নস্যি নিয়ে শেষে পণ্ডিত বলল, "কালকে আমি পাহারাওলা-বেজিকে পাঠাচ্ছি। বাঁদর কালকেও গুনবে। বেজি রিপোর্ট দিক, তারপর ঝগড়ার

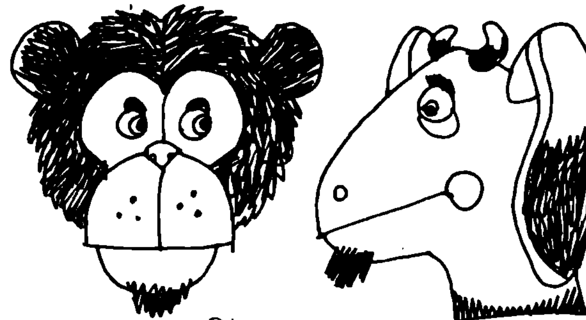

ফয়সালা হবে। বাজিটা অবশ্য ডবল হয়ে যাবে।"

পরদিন বেজি তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি, সদর দরজায় ঠুকঠুক আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এসে দেখে বাঁদর দাঁড়িয়ে, কী ব্যাপার ! বাঁদর চুপিচুপি যা বলল, তা হচ্ছে বিকেলবেলা শিয়াল-পণ্ডিতের কাছে বাঁদর যা বলবে তাতে যদি বেজি ঘাড় নেড়ে যায় তা হলে বেশ কিছু খাবারদাবার পাবে। আহ্লাদে আটখানা হয়ে ঘরে গিয়ে শুতেই আবার ঠক্‌ঠক্‌, এবারে ছাগল। তাকেও বলতে হল বিকেলবেলা সে যা বলবে তাতেই বেজি ঘাড় নাড়বে। ছাগল একটা র‍্যাপার দেবে, শীতকালটা ভালভাবেই কাটবে ভাবতে ভাবতে বেজি ঘুমোতে গেল।

সারাদিন ধরে যে যার মতো রইল, বিকেলবেলা শিয়াল-পণ্ডিতের বাড়ি অনেকে জড়ো হয়েছে। প্রথমে বাঁদর বলল, "আজকে নদীতে এক হাজার তিনশো পঁচিশটা ঢেউ এসেছে। হাওয়া কম ছিল, তাই ঢেউও কম হয়েছে।"

এরপর ছাগলের পালা। ছাগল বলল, "বাঁদর আজকে নদীর ঘাটে যায়ইনি।"

শিয়াল ঘুরে বেজির দিকে তাকাতেই বেজি উঠে গেল, তারপর পণ্ডিতের কানে কানে কী বলে এল। নাকে নস্যি নিয়ে শিয়াল-পণ্ডিত বলল, "বাঁদর ছাগলের কথাও শুনলাম, বেজির রিপোর্টও পেলাম।" সবাই নিশ্চুপ হয়ে তাকিয়ে আছে। শিয়াল বলতে লাগল, "যা শুনলাম তাতে বোঝা গেল গোনা শেষ হয়নি।"

বাঁদর ছাগল দুজনেই চেঁচিয়ে উঠল, "তা হলে ?"

শিয়াল একটু হেসে বলল, "তুমি বাপু যে ঢেউগুলো গেছে সেগুলোই কেবল গুনেছ, যেগুলো ফিরে এসেছে সেগুলো তো গোনোনি, তা ছাড়া..."

বাঁদর বলল, "তা ছাড়া ?"

শিয়াল বলল, "গুনতে হবে আরও অনেক। রাতের ঢেউ গুনতে হবে। পূর্ণিমাতে গুনতে হবে, অমাবস্যাতে গুনতে হবে, তাছাড়া শীত গ্রীষ্ম সব সময় গুনতে হবে। কাল থেকে গুনতে থাকো। মতামত দিতে গেলে আমাকে সবটা বিচার করতে হবে।"

বাঁদরের শুকনো মুখ থেকে এবার শেয়াল-পণ্ডিত ছাগলের দিকে মুখ ফেরাল, "আর ছাগল, এই এক বছর ধরে দিনরাত লক্ষ রাখবে। অবশ্য গোপনে গোপনে। বেজিও আমাকে রিপোর্ট দেবে। এক বছর পরে বিচারসভা বসবে এইখানে।"

বাঁদর ছাগলের কাঁদো-কাঁদো মুখের দিকে চেয়ে শিয়াল-পণ্ডিত শেষ কথাটা বলল, "অবশ্য এর মধ্যে যদি তোমরা তোমাদের ঝগড়াঝাঁটি মিটিয়ে ফ্যালো তো, ল্যাঠা চুকে যায় !"

ছবি : দেবাশিস দেব

মানুষ কেমন করে সাঁতার কাটে

সাঁতার কাটার আগে, কোনও কিছু ডোবে বা ভাসে কেন, সেই কথাটা বলা যাক। যদি কোনও জিনিসের ওজন সমান আয়তন জলের ওজনের চেয়ে কম হয়, তা হলে সেই জিনিসটা জলে ভাসে। যদি আবার উলটোটা হয় অর্থাৎ সমান আয়তন জলের ওজন জিনিসটার ওজনের চেয়ে কম হয়, তা হলে সেই জিনিস জলে না ভেসে ডুবে যাবে।

এখন সমস্ত মানুষটার ব্যাপারে মানুষের দেহটাকে আলাদা ধরি আর মাথাটাকে আলাদা। যদি শুধু দেহের সমান আয়তনের জল নিয়ে ওজন করা যায়, তা হলে দেহের চেয়ে জলের ওজন ভারী। কিন্তু কেবল মাথার ওজনের বেলায় উলটো। সেখানে সমান আয়তন জলের ওজন হালকা। তাই দেহটা যেখানে ভাসতে থাকে, মাথা সেখানে ডুবে যায়। আমরা যে সাঁতার শিখি, তা মাথাটাকে ভাসিয়ে রাখার জন্যে।

কিন্তু জন্তু-জানোয়ারেরা জলে এমনিই ভাসে, তাদের তো সাঁতার শিখতে হয় না। কেন?

এর কারণ জন্তু-জানোয়ারের মাথার ওজন সমান আয়তন জলের থেকে হালকা।

আয়নায় আলো পড়লে চকচক করে

সূর্যের আলো আয়নায় পড়লে কী রকম চকচক করে! ছেলেবেলায় ছোট আয়না সূর্যের আলোর মুখোমুখি রেখে তাকে ঘুরিয়ে ফেলতাম পথ-চলা মানুষের চোখে-মুখে। অন্যায়, কিন্তু মজা লাগত।

কিন্তু আয়নায় আলো পড়লে চকচক করে কেন? কত সময়ে দেওয়ালেও তো আলো পড়ে। কই সে আলো তো চকচক করে না।

আয়নায় যে প্রতিফলন হয়, দেওয়ালের প্রতিফলনের সঙ্গে তার তফাত আছে। আয়না মসৃণ, তাতে যে রশ্মিগুচ্ছ এসে পড়ে, তা একটা নির্দিষ্ট দিকে প্রতিফলিত হয়। ফলে এ-রকম প্রতিফলনের অধিকাংশ আলোকরশ্মি একটা নির্দিষ্ট দিকে এসে আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু আয়নার বদলে যদি দেওয়ালের কথা ভাবি, তা হলে দেওয়ালে পড়েও আলোকরশ্মি ফিরে আসছে। কিন্তু দেওয়াল তো আয়নার মতো মসৃণ নয়, বরং তা কিছুটা এবড়ো-খেবড়ো। সেইজন্যে আলোকরশ্মি দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসার পরে কোনও নির্দিষ্ট দিকে প্রতিফলিত না হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এরকম প্রতিফলনে চোখে খুব সামান্য অংশই এসে পড়ে। আর তাই আয়নায় আলো পড়লে চকচক করে, কিন্তু দেওয়ালে আলো পড়লে তা হয় না।

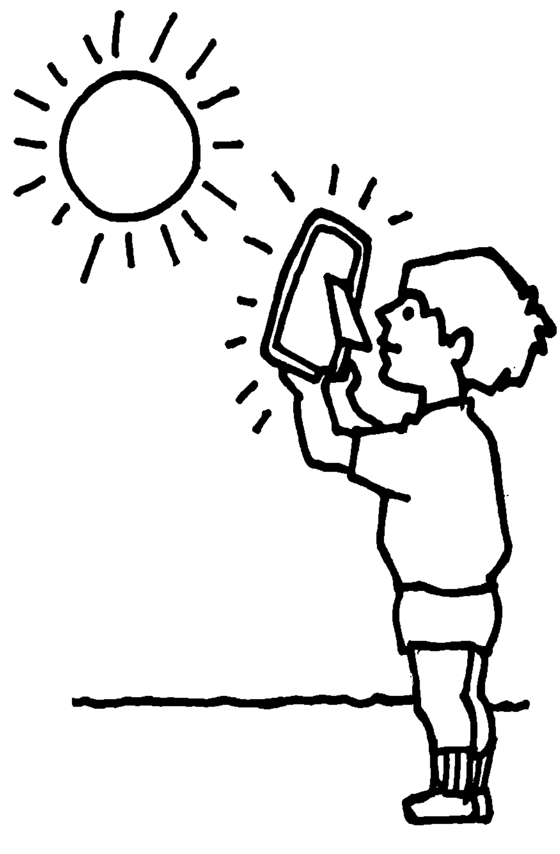

অরূপরতন ভট্টাচার্য

অর্থ জানো

বশংবদ…নিঃসপত্ন…

লক্ষ করে দ্যাখো, নীচের সব ক'টি বিশেষণ পদ। তোমরা জানো বিশেষণের কাজ হল শব্দকে বিশেষ করে বলা। বিশেষণ শুধু শব্দের প্রাণ দান করে না, তাকে উজ্জ্বল করে তোলে। উপযুক্ত বিশেষণ শব্দের সৌভাগ্য। নীচের শব্দের প্রতিটির পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে। শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে।

১। **বশংবদ**— (ক) অমায়িক, (খ) ভদ্র, (গ) বশীভূত, (ঘ) প্রশান্ত।

২। **তালেবর**— (ক) চতুর, (খ) সৌভাগ্যবান, (গ) তাগড়া জোয়ান, (ঘ) হুঁশিয়ার।

৩। **নিঃসপত্ন**— (ক) শত্রুহীন, (খ) পত্নীহীন, (গ) যার সতিন নেই, (ঘ) অবিবাহিত।

৪। **বিধুর**— (ক) মলিন, (খ) ভারাক্রান্ত, (গ) কম্পিত, (ঘ) বিষণ্ণ।

৫। **বিকচ**— (ক) বিকশিত, (খ) সুন্দর, (গ) আধ-ফোটা, (ঘ) সুগন্ধী।

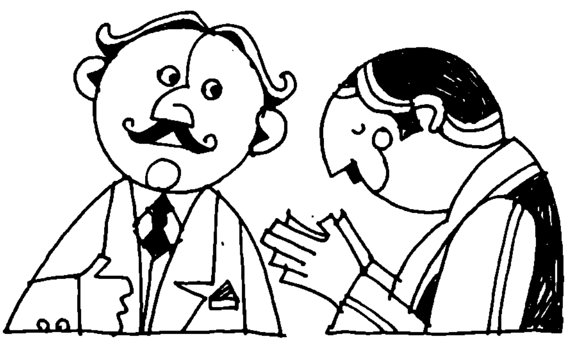

উত্তর : ১। **বশংবদ**— (গ) বশীভূত। মূল অর্থ 'আমি বশ' এমন কথা যে বলে। যেমন, 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে কলকাতার অধিকাংশ ধনীই ছিলেন ইংরাজদের বশংবদ।'

২। **তালেবর**— (খ) সৌভাগ্যবান। মূলে আছে আরবি শব্দ তালাবর। অর্থপ্রসারে এখন এর অর্থ মান্যগণ্য। যেমন, 'পেটে অসীম এলেম, তুখোড় ছোকরা তালেবর ব্যক্তি' (মুজতবা আলী)।

৩। **নিঃসপত্ন**— (ক) শত্রুহীন। যার সপত্ন অর্থাৎ শত্রু নেই। যেমন— 'নিঃসপত্ন রাজ্যমাঝে রত্নসিংহাসনে' (রবীন্দ্রনাথ)।

৪। **বিধুর**— (খ) ভারাক্রান্ত। ধুর শব্দের অর্থ ভার। অর্থ দাঁড়ায় দুঃসহ ভার যার। যেমন— 'আজি এই গন্ধবিধুর সমীরণে' (রবীন্দ্রনাথ)।

৫। **বিকচ**— (ক) বিকশিত। বি অর্থ বিগত, কচ অর্থ বন্ধন। যেমন— 'বিকশিত বনস্থল বিকচ ফুলে' (রবীন্দ্রনাথ)।

দেব-সেনাপতি

সহজে ইংরেজি

মধুরিমাদের বাড়িতে

পাড়ার যত ছেলেমেয়ে সেদিন জড় হয়েছিল চামেলির বন্ধু মধুরিমাদের বাড়ির দোতলার মস্ত হল-ঘরে। মধুরিমার বাবা-মা শ্রীজহর এবং শ্রীমতী রত্না দাশগুপ্ত সবাইকে অভ্যর্থনা করছিলেন।

When Chameli arrived the hall was pretty full. Mr. Dasgupta appeared on the stage put up at one end of the hall.

"Children, children!" he said in a loud voice, "the show is about to begin. Please be seated, all of you."

Some sat down, but many were still standing.

"Children, Children!" Mr. Dasgupta raised his voice again, "the show can't start until everyone has taken their seats."

Chameli looked about her. Shreemoyee was there. Also Jyotsna. It seemed to Chameli that everyone of her friends was there with their little brothers and sisters. Some were still moving about, looking for good seats.

"Everyone wants a good seat, don't they?" Chameli thought. "Naturally, because everyone loves a puppet show. Who can blame anyone for their eagerness to get a clear view of the stage?"

Then the hall went dark and the stage-lights went up. The show began.

এবারে এই বাক্যগুলো লক্ষ করো :

The show can't begin until everyone has taken their seats.

Everyone was there with their brothers and sisters.

Everyone wants a good seat, don't they?

Who can blame anyone for their eagerness?

তারপর নীচের কথাগুলো খুব মন দিয়ে পড়ো :

ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী এই সব সর্বনামের সঙ্গে একবচনের ক্রিয়াপদ লাগে :

anyone, everyone (has, was, wants)

কিন্তু যখন স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই কথা বলা হয়, তখন "হিজ-হার"-এর ঝামেলা এড়াবার জন্যে ওই সর্বনামগুলির সঙ্গে বহুবচনের এই সর্বনামগুলি ব্যবহার করা হয় :

their, them

ব্যাকরণের নিয়ম ঠিকঠাক মানতে হলে এই রকম করে বলতে হত :

Everyone was there with his or her brothers and sisters.

কিন্তু ভাল শোনায় না বলে ও-রকম করে বলা হয় না।

প্রসাদ

শুরু হল শার্লক হোমসের নতুন গল্প

সিলভার ব্লেজ

সার আর্থার কোনান ডয়েল

সকালবেলা। আমরা চা খাচ্ছিলুম। হোমস বলল, "ওয়াটসন, আমাকে একটু বাইরে যেতে হবে।"

"বাইরে ? কোথায় ?" আমি জিজ্ঞেস করলুম।

"কিংস্ পাইল্যান্ড, ডার্টমুরে।"

হোমসের কথায় আমি মোটেই অবাক হলুম না। সত্যি কথা বলতে কী, এই ব্যাপারে হোমসের এতদিন ডাক পড়েনি কেন এই ভেবেই আমি মনে মনে আশ্চর্য হচ্ছিলুম। ডার্টমুরে যে কাণ্ড ঘটে গেছে, তার আলোচনায় সারা ইংল্যান্ড একেবারে সরগরম। কাল সারা দিনটা হোমস ঘরের ভেতরে তার পরিচিত ভঙ্গিতে বুকের ওপর দু'হাত রেখে মাথা নিচু করে অনবরত পায়চারি করেছে। আর একটার পর একটা পাইপে কড়া তামাক পুরে সেগুলো টেনেছে। আমি তার সঙ্গে দু-একবার কথা বলবার চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু আমার কোনও কথাই তার কানে ঢোকেনি। আমাদের খবরের কাগজওয়ালা একটার পর একটা কাগজ এনে দিচ্ছিল। আর হোমস একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই কাগজগুলো ঘরের কোণে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। হোমস চুপচাপ থাকলেও কী নিয়ে যে এমন গভীরভাবে চিন্তা করছে, সেটা আমি টের পেয়েছিলুম। ঠিক এই মুহূর্তে সারা দেশের সামনে একটিই সমস্যা। আর সেই সমস্যার সমাধান করতে পারাটা শার্লক হোমসের সামনে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। সমস্যাটা হল যে, ওয়েসেক্স কাপ বাজিতে যে-ঘোড়াটা জিতবে বলে সকলে ধরে নিয়েছিল, সে-ঘোড়াটাই বা লোপাট হয়ে গেল কোথায়, আর তার ট্রেনারকেই বা খুন করল কে ? তাই হোমস যখন হঠাৎ যেখানে ওই মারাত্মক ঘটনাটা ঘটেছে সেখানে যাওয়ার কথা বলল, তখন আমার বেশ স্ফূর্তি হল।

আমি বললুম, "তোমার যদি অসুবিধে না হয় তো আমি তোমার সঙ্গে যেতে চাই।"

"ওয়াটসন, তুমি সঙ্গে থাকলে আমার খুব সুবিধে হবে। তোমাকে এটুকু বলতে পারি যে, ওখানে গেলে তোমার সময়টা নষ্ট হবে না। এই ব্যাপারটার মধ্যে এমন কতকগুলো জিনিস আছে, যেগুলো সত্যিই খুব ভাববার। সে কথা থাক। এখনই আমাদের তৈরি হয়ে প্যাডিংটনের দিকে যেতে হয়। ট্রেনের খুব দেরি নেই। সব কথা আমি তোমাকে গাড়িতে যেতে যেতে বলব। ভাল কথা, তুমি তোমার সেই দারুণ বায়নাকুলারটা সঙ্গে নিতে ভুলো না।"

ঘণ্টাখানেক পরে ট্রেনের একটা ফার্স্টক্লাস কামরার জানালার ধারে দুটো সিট দখল করে আমরা ডার্টমুরের পথে এক্জিটারের দিকে ছুটে চললুম। হোমস প্যাডিংটন স্টেশনে একগাদা খবরের কাগজ কিনেছিল। সে গম্ভীর মুখে একমনে কাগজগুলো পড়তে লাগল।

হোমস যখন খবরের কাগজ পড়া শেষ করল, তখন আমরা রেডিং স্টেশন ছাড়িয়ে চলে গেছি। কাগজগুলো বেশ ভাল করে ভাঁজ করে একপাশে সরিয়ে রেখে হোমস নিজের সিগার কেসটা আমার দিকে এগিয়ে দিল।

হোমস জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছিল। একবার হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল, "গাড়িটা বেশ ভালই যাচ্ছে। আমরা এখন ঘণ্টায় সাড়ে তিপ্পান্ন মাইল বেগে যাচ্ছি।"

"এদিকে বুঝি সিকি মাইল অন্তর পোস্ট আছে। একদম খেয়াল করিনি তো," আমি বললুম।

"না, আমিও দেখতে পাইনি। তবে লক্ষ করলে দেখবে, লাইনের ধারে টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলো ষাট গজ পর পর বসানো। তার থেকে গাড়িটা কত মাইল স্পিডে যাচ্ছে, সেটা কষে বের করে নেওয়া মোটেই শক্ত নয়। সে-কথা থাক। জন স্ট্রেকার লোকটির খুন হওয়া আর সিলভার ব্লেজ নামে ঘোড়াটার লোপাট হওয়ার খবরটা তুমি নিশ্চয়ই মোটামুটি জানো ?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ, 'টেলিগ্রাফ' আর 'ক্রনিকল' পত্রিকায় যতটুকু বেরিয়েছে, ততটুকুই জানি।"

"এই রহস্যের মামলাটা একটু অন্য ধরনের। এই ধরনের রহস্যের জট খুলতে গেলে গোয়েন্দার প্রথম কাজ হল, ঘটনাগুলো পর পর যেমন যেমন ঘটেছে সেইভাবে সাজিয়ে নেওয়া। নতুন কোনও তথ্য বা সূত্রের সন্ধান পরেও করা যেতে পারে। এই ব্যাপারটা এমনই অদ্ভুত, এমনই আটঘাট বেঁধে ভেবেচিন্তে করা যে, তার ফলে আমাদের সামনে নানান মত, উদ্ভট কল্পনা, মিথ্যে গালগল্পের পাহাড় জমে উঠেছে। তাই সবচাইতে গোড়ার কাজ যেটা, সেটা হল এই সব আবোলতাবোল মিথ্যে গালগল্পের মধ্য থেকে সত্য ঘটনাকে ঝেড়েবেছে নিয়ে রহস্যের কাঠামোটা ঠিক করা। সেটা করে নিয়ে প্রত্যেকটা ঘটনাকে আলাদা আলাদা করে বিশ্লেষণ করতে হবে। সেই বিশ্লেষণ থেকে কতকগুলো অনুমান করা যাবে। সেই অনুমানগুলোকে বিচার করলে বোঝা যাবে, কোন্ পথে গেলে রহস্যের জট খোলা যাবে। মঙ্গলবার সন্ধেবেলায় আমি দুটো টেলিগ্রাম পেয়েছি। একটা তার পাঠিয়েছেন সিলভার ব্লেজ ঘোড়ার মালিক, কর্নেল রস। আর একটি তার পাঠিয়েছেন ইন্সপেক্টর গ্রেগরি, যিনি এই রহস্যের অনুসন্ধান করেছেন। গ্রেগরি আমার সাহায্য চেয়েছেন।"

আমি একটু রেগেই বলে উঠলুম, "টেলিগ্রাম পেয়েছ মঙ্গলবার, আর আজ হচ্ছে বৃহস্পতিবার। তুমি গতকালই গেলে না কেন ?"

"না, যাইনি। আমি ভুল করেছি। ওয়াটসন, তোমার লেখা পড়ে সাধারণ লোকের মনে আমার সম্বন্ধে যে ধারণা গড়ে উঠেছে সেটা ঠিক নয়। সকলে ভাবে আমার ভুল হয় না। তা নয়, আমারও ভুল হয়। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, এমন কাণ্ড ঘটতে পারে এ-কথা আমি বিশ্বাস করতেই পারিনি। ডার্টমুর এমনিতেই খুব নির্জন জায়গা। লোকজনের বসতি কম। সিলভার ব্লেজের মতো নামডাকওলা ঘোড়াকে, যাকে লোকে দেখলেই চিনতে পারবে, কেউ লুকিয়ে রাখতে পারবে

বলে আমার মনে হয়নি। কাল সারাদিন আমি আশা করেছি। সিলভার ব্লেজকে ফিরে পাওয়ার আর স্ট্রেকারের আততায়ীর গ্রেফতারের খবর পাওয়ার জন্যে আমি সকাল থেকে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে থেকেছি। কিন্তু আজ সকালে খবরের কাগজ পড়ে যখন জানতে পারলুম, পুলিশ ফিটস্‌ রয় সিমসনকে গ্রেফতার করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি তখনই ঠিক করে ফেললুম, এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। তবে কালকের দিনটা একদম বৃথাই যায়নি।"

"ও, তুমি তা হলে একটা হদিস পেয়েছ?"

"না, তা ঠিক নয়। তবে মূল ঘটনাটা যে কী, তা জানতে পেরেছি। তোমাকে সব খুলে বলছি, মন দিয়ে শোনো। সব কথা না জানলে তোমার পক্ষে আমাকে সাহায্য করা সম্ভব নয়। সবচেয়ে বড় কথা, তোমাকে ব্যাপারটা বললে সবকিছু আমার নিজের কাছেও স্পষ্ট হবে।"

একটা সিগার ধরিয়ে গদিতে হেলান দিয়ে আমি বেশ জুত করে বসলুম। হোমস সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে পড়ে ডান হাতের আঙুল দিয়ে বাঁ হাতের চেটোয় দাগ টানতে টানতে কথা বলা শুরু করল।

"সিলভার ব্লেজ ইসোনমি বংশের ঘোড়া। খুব ভাল ঘোড়া। মাত্র পাঁচ বছর বয়েস। এর মধ্যেই ঘোড়াটা যত নামকরা বাজি আর দৌড় আছে, সব ক'টায় জিতেছে। সেদিক দিয়ে সিলভার ব্লেজের মালিক কর্নেল রসকে বেশ ভাগ্যবান বলতে হয়। সকলেই ধরে নিয়েছে যে, ওয়েসেক্স কাপ দৌড়েও সিলভার ব্লেজই ফার্স্ট হবে। তা হলে বুঝতেই পারছ যে, ঘোড়াটাকে লোপাট করে দিতে পারলে অনেক লোকেরই সুবিধে হবে।

"আর এ-কথা কিংস পাইল্যান্ডে, যেটা কর্নেল রসের আস্তাবল, সকলেই জানে। আর সেই কারণে সিলভার ব্লেজকে সর্বদাই কড়া পাহারায় চোখে-চোখে রাখা হত। সিলভার ব্লেজকে দেখাশোনার ভার, তাকে দৌড়ের জন্যে ঠিকঠাক রাখার ভার ছিল ওই জন স্ট্রেকারের ওপর। স্ট্রেকার প্রথমে ছিলেন 'জকি'। প্রায় বছর পাঁচেক তিনি কর্নেল রসের জকি ছিলেন। ইদানীং তিনি এত বেশি মোটা হয়ে গেছেন যে জকি হতে পারেন না। গত সাত বছর উনি কর্নেল রসের ঘোড়ার তদারকি করেন। আজ পর্যন্ত তাঁর কাজে কোনও গাফিলতি ধরা পড়েনি। স্ট্রেকারকে সাহায্য করবার জন্যে আরও তিনজন ছোকরা আছে। কর্নেল রসের আস্তাবলটাও খুব বড় নয়। মোটে চারটে ঘোড়া আছে। আস্তাবলে কাজের জন্যে যে ছেলেগুলি আছে, তারা এক-একজন পালা করে সারারাত্তির পাহারা দেয়। আর বাকি দু'জন আস্তাবলের উপরে যে মাচা আছে, সেখানে ঘুমোয়। ওই ছেলেগুলির স্বভাব-চরিত্র খুবই ভাল। জন স্ট্রেকারের স্ত্রী আছে। আস্তাবল থেকে আন্দাজ পাঁচশো গজ দূরে একটা ছোট বাংলো ধরনের বাড়িতে ওঁরা থাকেন। ওঁদের ছেলেপিলে নেই। ঘর-সংসারের কাজ করবার জন্যে একটা মেয়ে আছে। সে ওই বাড়িতেই থাকে। স্ট্রেকারের অবস্থা বেশ ভাল। ওঁরা যেখানে থাকেন, সেখানটা ফাঁকা-ফাঁকা। লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। আস্তাবল আর স্ট্রেকারের বাড়ির কাছাকাছি জনবসতি বলতে কতকগুলো ছোট বাড়ি। ট্যাভিস্টকের এক কন্ট্রাক্টর-ভদ্রলোক এই বাড়িগুলো তৈরি করিয়ে দেন। যাঁরা শরীর সারাবার জন্যে 'চেঞ্জে' আসেন তাঁরা ওই সব বাড়িতে ভাড়া দিয়ে থাকেন। এই বাড়িগুলো স্ট্রেকারের বাড়ি আর আস্তাবলের খাড়া উত্তরে আধমাইলটাক দূরে। এখান থেকে পশ্চিমে ট্যাভিস্টক, মাইল-দুয়েক দূরে। কর্নেল রসের আস্তাবল থেকে দু-আড়াই মাইল দূরে ঠিক মাঠের উলটো দিকে লর্ড ব্যাকওয়াটারের আস্তাবল কেপল্টন। সাইলাস ব্রাউন হচ্ছে এই আস্তাবলের কর্তা। এ ছাড়া চারদিকে ধুধু করছে তেপান্তরের মাঠ। মাঝে-মাঝে জিপসিদের এই মাঠে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। এইরকম অবস্থায় গত সোমবার রাত্তিরে দুর্ঘটনাটি ঘটল।

"সেদিনও সন্ধেবেলায় ঘোড়াগুলোকে নিয়মমতো ছুটিয়ে আনা হয়। তারপর জল দিয়ে ঘোড়াগুলোর গা ধুইয়ে, ভালমতন দলাইমলাই করে ঠিক রাত ন'টার সময় আস্তাবলের দরজায় তালা-চাবি দিয়ে দেওয়া হয়। দু'জন ছোকরা রাতের খাওয়া সেরে নিতে স্ট্রেকারের বাড়ি যায়। আর একজন, তার নাম নেড হান্টার, আস্তাবলে বাড়ির পাহারা দেবার জন্যে থেকে যায়। ন'টা বাজবার কিছুক্ষণ পরেই স্ট্রেকারের বাড়ির

কাজের মেয়েটি, নাম এডিথ বাক্সটার, নেডের খাবার নিয়ে আস্তাবলের দিকে আসছিল। খাবার বলতে মাটন কারি। জলের ব্যবস্থা আস্তাবলেই আছে। যে-রাতে যার উপর আস্তাবল পাহারার ভার থাকে, তাকে সে-রাতে জল ছাড়া অন্য কোনও পানীয় দেওয়া হয় না। একে তো কৃষ্ণপক্ষের ঘুটঘুটে অন্ধকার, তার ওপর রাস্তাটা গেছে ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে। তাই আস্তাবলে আসবার সময় এডিথ একটা লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়েছিল।

"এডিথ যখন আস্তাবলের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, তখন অন্ধকার ফুঁড়ে একটি লোক তার সামনে হাজির হল। এডিথ বেশ আশ্চর্য হয়ে পড়েছিল। তাই লোকটি তাকে দাঁড়াতে বললে সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। লোকটি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে এডিথের হাতের লণ্ঠনের আলো পড়ছিল। লণ্ঠনের আলোয় এডিথ দেখল যে, লোকটির চেহারা এবং বেশবাস ভদ্রলোকের মতো। তার মাথায় ছিল কাপড়ের টুপি আর গায়ে ছাইরঙের কোট-প্যান্ট। ভদ্রলোকের হাতে একটা খুব মোটা লাঠি। আর লাঠির হাতলটাও বেশ মজবুত। ভদ্রলোককে দেখে এডিথের চোখে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি করে পড়েছিল, সেটা হল ভদ্রলোকের অস্বাভাবিক সাদাটে মুখ-চোখ আর একটা গোরুচোর-গোরুচোর ভাব। এডিথের মনে হয়েছিল ওঁর বয়েস তিরিশের বেশি, কম কিছুতেই নয়।

"এডিথকে ডেকে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা, আমি ঠিক কোথায় এসে পড়েছি বলতে পারেন? ভাবছিলুম আজকের রাতটা বুঝি এই ফাঁকা মাঠেই কাটাতে হবে। এমন সময় হঠাৎ আপনার লণ্ঠনের আলোটা চোখে পড়ল।'

"'এটা হল কিংস পাইল্যান্ড আস্তাবলের কাছাকাছি।'

"'তাই নাকি! খুব জোর বরাত বলতে হবে,' ভদ্রলোক বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। 'শুনেছি আস্তাবলে রাত্তিরে পাহারা দেবার জন্যে একটি ছেলে থাকে। আপনি বোধহয় তার খাবার নিয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, আমি যদি আপনাকে একটা নতুন পোশাকের দাম উপহার দিতে চাই, আপনি কি তা হলে রেগে যাবেন?' এরপর ভদ্রলোক তাঁর ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ এডিথের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এই কাগজটা যদি এক্ষুনি আস্তাবলের পাহারাওলা ছেলেটিকে পৌঁছে দিতে পারেন তো, সবচাইতে দামি পোশাকটি আমি আপনাকে কিনে দেব।'

"ভদ্রলোক এমন গম্ভীরভাবে কথাগুলো বললেন যে, এডিথের ভয় হয়ে গেল। সে আর সেখানে এক মুহূর্তও না দাঁড়িয়ে ভদ্রলোককে কোনওরকমে পাশ কাটিয়ে আস্তাবলের দিকে দৌড় লাগাল। খাবারদাবার দেবার জন্যে আস্তাবলে একটা ঘুলঘুলির মতো জানালা আছে। জানালাটা খোলাই ছিল। আস্তাবলের ভেতরে জানালার কাছে হান্টার একটা টেবিল-চেয়ার নিয়ে বসে ছিল। এডিথ হান্টারকে যখন সব কথা বলছে, তখন সেই ভদ্রলোক সেখানে গিয়ে হাজির।

"'গুড ইভনিং,' জানালার কাছে এসে এডিথের পাশে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোকটি হান্টারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।' এডিথ পুলিশকে বলেছে যে ভদ্রলোকটি যখন হান্টারের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন তাঁর হাতে সে একটা মোড়ক-করা কাগজ দেখেছিল।

"'এখানে আপনার কী দরকার?' হান্টার বেশ বিরক্ত হয়ে লোকটিকে প্রশ্ন করেছিল।

"'আমার একটু দরকার আছে বইকী। আর সেই দরকার থেকে তোমারও দু-চার পয়সা রোজগার হতে পারে। ওয়েসেক্স কাপ বাজিতে তোমাদের দুটো ঘোড়া ছুটবে, সিলভার ব্লেজ আর বেয়ার্ড। এখন আমি যা জানতে চাইছি তুমি যদি তার ঠিক-ঠিক জবাব দিতে পারো, তো তোমার লোকসান হবে না। বাজারের খবর হচ্ছে, পাঁচ ফার্লংয়ের দৌড়ে বেয়ার্ড নাকি সিলভার ব্লেজকে একশো গজে হারিয়ে দিতে পারে। এটা কি খাঁটি খবর?'

"ভদ্রলোকের কথায় হান্টার চিৎকার করে বলে, 'পাজি, শয়তান, দাঁড়াও দেখাচ্ছি তোমায় মজা। কিংস পাইল্যান্ডে তোমার মতো দালালদের কী দাওয়াই দেওয়া হয় দেখাচ্ছি।' তারপর চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে সে ছুটে যায় আস্তাবলের কুকুরটাকে লোকটির পেছনে লেলিয়ে দেবার জন্যে। গোলমাল দেখে এডিথ তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পালায়। তবে দৌড়ে পালাবার সময়ে সে একবার পেছন দিকে ফিরে তাকাতে দেখতে পায় যে, লোকটি জানালার সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কী যেন দেখছে। মিনিটখানেক পরে হান্টার কুকুরটাকে নিয়ে আস্তাবলের বাইরে এসে লোকটিকে আর দেখতে পায়নি। পরে আস্তাবলের চারদিকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার টিকিটি দেখা যায়নি।"

হোমসকে বাধা দিয়ে আমি বললুম, "এক মিনিট। হান্টার ছোকরা যখন লোকটিকে তাড়া করে বেরিয়ে আসে তখন সে আস্তাবলের দরজায় তালা-চাবি দিয়েছিল কি?"

"চমৎকার, ওয়াটসন, চমৎকার," হোমস আমাকে তারিফ করল, "কথাটা আমার গোড়াতেই মনে হয়েছিল। সঠিক ব্যাপারটা জানবার জন্যে কালকে আমি ডার্টমুরে একটা বিশেষ টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলুম। জানতে পেরেছি হান্টার তালা-চাবি লাগিয়েছিল। আর ওই জানালা বা ঘুলঘুলি যাই বলো না কেন, সেটা এত ছোট যে, তার মধ্য দিয়ে ঢোকা বা বেরিয়ে আসা একেবারেই অসম্ভব।

"এরপর হান্টার তার অন্য দু'জন সঙ্গী ফিরে না আসা পর্যন্ত আস্তাবলেই বসে ছিল। তারা ফিরে এলে সে যা-যা ঘটেছে সেই খবর স্ট্রেকারকে পাঠায়। খবরটা শুনে স্ট্রেকার খুবই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু এই ঘটনার আসল তাৎপর্যটা যে কী সেটা তিনি বুঝে উঠতে পারেননি, তবে তিনি বেশ ভাবনায় পড়ে যান। রাত্তির একটা নাগাদ মিসেস স্ট্রেকারের ঘুম ভেঙে যায়। তিনি দেখেন যে, মিঃ স্ট্রেকার বাইরে যাওয়ার জন্য জামা-কাপড় পরছেন। মিঃ স্ট্রেকার তাঁর স্ত্রীকে বলেন যে, আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়াগুলো সব ঠিকঠাক আছে কি না, একবার দেখে না এলে তাঁর শান্তি হচ্ছে না। তিনি ঘুমোতে পারছেন না। বাইরে তখন বেশ বৃষ্টি হচ্ছিল। সেই বৃষ্টির মধ্যে মিসেস স্ট্রেকার তাঁর স্বামীকে বাইরে যেতে বারণ করেন। কিন্তু তাঁর কথায় কান না দিয়ে মিঃ স্ট্রেকার ম্যাকিন্টশটা গায়ে চাপিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন।" (ক্রমশ)

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
হাসপাতাল থেকে শিশুদের উদ্ধার করেছে টারজান আর আকুত, কিন্তু তার পরেই ঘটল বিপর্যয়।
দেখছ কী, ওকে গ্রেফতার করো!
যা দেখলুম, তার পরেও গ্রেফতার করব? অসম্ভব!
চলো আকুত, বাড়ি যাই!
হ্যারিস, ওই তা হলে টারজান? ওর সম্পর্কে যা জানো, বলো!
রিপোর্টার তো আমরাও!
কিচ্ছু জানি না!
কী করছেন উনি?
আকুতকে 'বাড়ি' নিয়ে যাচ্ছেন!
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গোলমাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : হরিবাবুকে পঞ্চানন্দ জানায়, সে তাঁর স্বর্গত পিতা উদ্ভটবিজ্ঞানী শিবু হালদারের কাছ থেকে আসছে। সে নাকি তাঁর শাকরেদ ছিল। হরিবাবুর ছোট ভাই ন্যাড়া কুস্তি শেখে গজ-পালোয়ানের কাছে। আর এক ভাই জরিবাবু শেখেন কালোয়াতি গান। হরিবাবুর দুই ছেলে ঘড়ি ও আংটির খেলা দেখে যে-মহারাজা তাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন, বাসের মধ্যে খুন হয় তাঁর সেক্রেটারি। গজ'র ডেরা চক-সাহেবের পোড়োবাড়িতে ঢুকে যে-লোক মারা যায়, তার লাশ মেলেনি। সেক্রেটারির লাশও বেপাত্তা। মধ্যরাতে শিবুবাবুর ল্যাবরেটরিতে মূল্যবান কিছুর খোঁজে ঢুকেছিল গজ ; তিন অতিকায় মূর্তি তাকে বন্দী করে। চক-সাহেবের বাড়িতে উঁকি মেরে পঞ্চানন্দ যাকে দেখতে পায়, তার ক্ষমতা সীমাহীন। হরিবাবু ছাতে উঠে নীল চাঁদ দেখে কবিতা লেখেন। পঞ্চানন্দ বলে, সেটা উড়ন্ত চাকি। চক-সাহেবের বাড়িতে যাবার পথে সে আক্রান্ত হয়। ঢ্যাঙা আততায়ীকে ঘায়েল করে সেই তিনটে অতিকায় লোক, গজকে যারা আটকে রেখেছে। বিদ্যুতের বেড়া অপসৃত হয়েছে বুঝে এগিয়ে যেতেই কাঁকড়াবিছের কামড় খায় গজ, তারপর খানিক হেঁটে এক জলায় বেহুঁশ পড়ে যায়। জ্ঞান ফিরে পেয়ে পঞ্চানন্দও খানিক এগিয়ে গজ'র খোঁজ পায়। কিন্তু গজ'র ছিপছিপে শরীর ইতিমধ্যে হাতির মতন হয়ে গেছে। উড়ন্ত চাকি দেখে ঘড়ি ও আংটিও বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। চক-সাহেবের বাড়িতে ঢুকে আংটি ঘুম লাগায়। ঘড়ি যে কাঁকড়াবিছেটাকে জুতোর তলায় চেপে ধরে, সেটা যান্ত্রিক। এদিকে আংটি সন্ধান পায় প্রথমে সেই মহারাজার 'মৃত' সেক্রেটারির, পরে স্বয়ং মহারাজার। মহারাজা বলেন, পৃথিবীকে বোধহয় বাঁচানো সম্ভব হবে না। তারপর···

আর্থ-মনিটর কাকে বলে, তা আংটি জানে না। কিন্তু সে এটা বেশ বুঝতে পারছিল যে, সাধারণ ক্যালকুলেটরের মতো দেখতে হলেও যন্ত্রটা সামান্য নয়। মহারাজ যন্ত্রটা হাতে নিয়েই কী একটু কলকাঠি নাড়লেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে যন্ত্রটার চার কোণ দিয়ে চারটে লিকলিকে অ্যান্টেনা বেরিয়ে এল। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল, চারটে অ্যান্টেনাই নড়ন্ত। নিজে থেকেই অ্যান্টেনাগুলো কখনও ওপরে কখনও নীচে ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছে, আবার সটান সোজা হয়ে যাচ্ছে, ছোট হয়ে যাচ্ছে, আবার গলা বাড়িয়ে লম্বা হয়ে যাচ্ছে। চারটে ধাতব যষ্টির ওরকম যথেচ্ছ নড়াচড়া দেখে আংটির গা শিরশির করতে থাকে।

মহারাজ যন্ত্রটির দিকে চেয়ে কী দেখছিলেন তিনিই জানেন। শরীরটা পাথরের মতো স্থির, চোখের পলক পড়ছে না। মহারাজকে খুব তীক্ষ্ণ চোখেই লক্ষ করছিল আংটি। করে তার মনে হল, এরকম মানুষ সে কখনও দ্যাখেনি। লোকটা লম্বা-চওড়া সন্দেহ নেই, গায়েও বোধহয় অসীম ক্ষমতা। তার চেয়েও বড় কথা, লোকটা যে-সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছে তা একমাত্র খুব উঁচুদরের বিজ্ঞানীরাই বোধহয় করে থাকে। টেবিলের ওপর রাখা গোলকটাও লক্ষ করল আংটি। গ্লোবের মতো দেখতে হলেও মোটেই গ্লোব নয়। ঠিক যেন আকাশের জ্যান্ত মডেল। তাতে গ্রহ তারা নক্ষত্রপুঞ্জের চলমান ছবি দেখা যাচ্ছে।

মহারাজ ক্যালকুলেটর থেকে মুখ তুলে বললেন, "আংটি, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, জবাব দেবে ?"

আংটি ভয়ে সিঁটিয়েই ছিল। সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"যদি তোমাদের এই পৃথিবীকে সৌরজগতের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়, তা হলে কী ঘটতে পারে জানো ?"

আংটি অবাক হয়ে বলল, "তা হলে পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে।"

মহারাজ মাথাটা ওপরে-নীচে মৃদুভাবে নাড়িয়ে বললেন, "ঠিক তাই। সৌরজগতের বাইরে টেনে নিয়ে যাওয়ামাত্রই পৃথিবীর উপরিভাগে যা কিছু আছে, সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। একটা জীবাণু অবধি বেঁচে থাকবে না, তা বলে পৃথিবী নামক ম্যাসটি নষ্ট হবে না। এটাকে যদি অন্য কোনও নক্ষত্রের কক্ষপথে স্থাপন করা হয়, তা হলে আবার এই গ্রহটিকে কাজে লাগানো সম্ভব হবে। আবহমণ্ডল তৈরি করে নতুন বসত গড়ে তোলা কঠিন হবে না।"

আংটি কিছুই না বুঝে চেয়ে রইল।

মহারাজ একটু হাসলেন। খুবই বিষণ্ণ আর ম্লান দেখাল তাঁর মুখ। মাথাটা নেড়ে বললেন, "আমি পাকেচক্রে পৃথিবীতে এসে পড়েছি বটে, কিন্তু অল্প কিছু দিনের মধ্যেই গ্রহটাকে ভালও বেসে ফেলেছি। মনে-মনে ভেবেছি, এই গ্রহটাকে ইচ্ছে করলে কত না সুন্দর করে তোলা যায়।"

মহারাজ যেন আবেগভরে একটু চুপ করে রইলেন।

আংটির গলায় স্বর আসছিল না। বেশ একটু কসরত করেই গলায় স্বর ফুটিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কোথা থেকে এসেছিলেন ?"

মহারাজ মৃদু স্বরে বললেন, "সে আর-এক কাহিনী। পরে কখনও শোনাব। শুধু জেনে রাখো, আমি বিদেশী। বহু কোটি মাইল দূরের আর-এক জায়গা থেকে আমি এসেছি।"

আংটি এত অবাক হল যে, হাঁ করে চেয়ে থাকা ছাড়া তার আর কিছুই করার ছিল না। মহারাজকে গুলবাজ বলে মনে হলে সে এত অবাক হত না। কিন্তু এ-লোকটার গ্র্যানাইট পাথরের মতো কঠিন মুখ, তীক্ষ্ণ গভীর চোখ এবং হাবভাবে এমন একটা ব্যক্তিত্বের পরিচয় সে পাচ্ছিল যে, অবিশ্বাস্য হলেও তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল। আর বিশ্বাস করছিল বলেই মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছিল তার।

মহারাজ তাঁর যন্ত্রের দিকে ফের কিছুক্ষণ চুপচাপ চেয়ে রইলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আংটির দিকে চেয়ে বললেন, "এসো।"

মহারাজ হলঘরটার আর এক প্রান্তে গিয়ে একটা পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। পিছনে যন্ত্রচালিতের মতো হেঁটে এসে আংটিও দাঁড়াল। মহারাজ পর্দাটা হাত দিয়ে সরাতেই একটা টেলিভিশনের মতো বস্তু দেখা গেল। মহারাজ সুইচ

টিপতেই পর্দায় নানারকম আঁকিবুকি হতে লাগল।

আংটি বলল, "এটা কী?"

মহারাজ মৃদু স্বরে বললেন, "কয়েকজন বর্বর কী কাণ্ড ঘটাতে চলেছে তা তোমাকে দেখাচ্ছি।"

মহারাজ একটা নব ঘোরালেন। পর্দায় একটা আবছা দৃশ্য ফুটে উঠল। ঘন কুয়াশার মধ্যে কী যেন একটা লম্বাটে জিনিস। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

মহারাজ বললেন, "এই যে আবছা জিনিসটা দেখছ, এটাও পৃথিবীর নয়। বহু দূর থেকে এসেছে।"

"এটা কি মহাকাশযান?"

"হ্যাঁ। খুবই উন্নত ধরনের যন্ত্র। শুধু মহাকাশই পাড়ি দেয় না, আরও অনেক কিছু করে।"

পর্দার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে ছিল আংটি। গল্পে উপন্যাসে সে অন্য গ্রহের উন্নত জীবদের নানা কাণ্ড-কারখানার কথা পড়েছে। নিজের চোখে দেখবে তা ভাবেনি। সে স্বপ্ন দেখছে না তো!

পর্দার ছবিটা একটু পরিষ্কার হল। দেখা গেল, বিশাল দৈত্যের আকারের কয়েকটা জীব মহাকাশযানের মস্ত দরজা দিয়ে ওঠানামা করছে। মনে হল তারা কিছু খুচরো জিনিস নামাচ্ছে।

আংটি ভিতু গলায় জিজ্ঞেস করে, "ওরা কারা?"

মহারাজ মৃদু স্বরে বললেন, "ওরা কারা তা আমিও সঠিক জানি না। তবে খুবই উন্নত-বুদ্ধিবিশিষ্ট কিছু বর্বর। বেশ কিছুদিন যাবৎ এরা পৃথিবীতে নানা জায়গায় থানা গেড়ে আছে। সমুদ্রের নীচে, পাহাড়ে, মেরু অঞ্চলে। নানাভাবে এরা পৃথিবীকে পরীক্ষা করে দেখছে।"

"কেন? ওরা কি পৃথিবীকে কিছু করবে?"

মহারাজ হেসে বললেন, "শুনলে হয়তো তোমার অবিশ্বাস হবে। আসলে ওরা বোধহয় পৃথিবীকে চুরি করতে চায়।"

"চুরি?"

"ওরা অন্য একটা জগতে থাকে। ওদের বাসও এই তোমাদের সৌরমণ্ডলের মতোই একটি কোনও নক্ষত্রের মণ্ডলে। আমার বিশ্বাস, ওদের মণ্ডলে অনেকগুলো গ্রহ জুড়ে ওরা বসবাস করে। সম্ভবত বাসযোগ্য আরও গ্রহ ওদের দরকার।"

আংটি শিউরে উঠে বলে, "ও বাবা! আমার মাথা ঘুরছে।"

মহারাজ মৃদু হেসে বললেন, "তোমাদের বিজ্ঞান যেখানে আছে, সেখান থেকে ভাবলে এসব প্রায় অবিশ্বাস্যই মনে হয় বটে। তবে আমি যা বলছি,তা তুমি অন্তত অবিশ্বাস কোরো না।"

আংটি নিজের মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে নিয়ে বলল, "ঠিক আছে।"

মহারাজ মৃদু হেসে বললেন, "আমার মনে হয় পছন্দমতো একটা গ্রহ খুঁজে বের করতে ওরা মহাকাশে পাড়ি দিয়ে তোমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে। নানাভাবে পরীক্ষা করে ওরা বুঝেছে যে, এরকম একটা গ্রহ হলে ওদের ভালই হয়। এখন কাজ হল পৃথিবীকে ঠেলে নিজেদের নক্ষত্রের মণ্ডলে নিয়ে যাওয়া। ওদের পক্ষে সেটা তেমন কিছু শক্ত কাজ নয়।"

আংটি আতঙ্কিত হয়ে বলল, "তা হলে আমাদের কী হবে? এত মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা?"

"সৌরমণ্ডল থেকে ছিটকে গেলে পৃথিবীর উপরিভাগের সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। নষ্ট হয়ে যাবে আবহমণ্ডল! দারুণ ঠাণ্ডায় সব জমে পাথর হয়ে যাবে। ওরা ওদের নক্ষত্রমণ্ডলে নিয়ে গিয়ে পৃথিবীতে আবার আবহমণ্ডল তৈরি করবে। আমার বিশ্বাস, ওরা পৃথিবীকে ওদের কৃষি-গ্রহ হিসেবে ব্যবহার করবে। আমাদের নিজেদের মণ্ডলে আমরাও এক-একটা গ্রহকে এক-এক কাজে ব্যবহার করি।"

আংটি সবিস্ময়ে বলে, "আপনাদের ক'টা গ্রহ আছে?"

"একান্নটা। তাতে আমাদের কুলোয় না। কিন্তু তা বলে আমরা মানুষজন গাছপালা-সহ কোনও গ্রহ চুরির কথা ভাবতেও পারি না। ওরা বর্বর বলেই এরকম নৃশংস কাজ করতে পারে।"

"এখন তা হলে কী হবে?"

মহারাজ চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "সেটাই ভাবছি। বেশ কিছুদিন আগে আমি একটি দুর্ঘটনায় পড়ে তোমাদের পৃথিবীতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হই। আমার মহাকাশযান অকেজো হয়ে গেছে, মেরামত করতে অনেক সময় লাগবে। আমার কাছে এখন তেমন কোনও অস্ত্রশস্ত্র নেই, যা দিয়ে বর্বরদের মোকাবিলা করা যায়।"

আংটি আশান্বিত হয়ে বলল, "কিন্তু আমাদের অ্যাটম বোমা আছে, হাইড্রোজেন বোমা আছে, নাইট্রোজেন বোমা আছে।"

মহারাজ মাথা নেড়ে বললেন, "সে-সব আমি জানি। বর্বররাও সব খবর রাখে। তোমাদের কোনও অস্ত্রই কাজে লাগবে না। ওরা সবই সময়মতো অকেজো করে দেবে। পৃথিবীর কোথায় কী আছে, তার সব খবরই ওদের নখদর্পণে। ওরা তোমাদের কোনও সুযোগই দেবে না। আজ ওদের যে মহাকাশযান এসেছে, তাতে কিছু অদ্ভুত যন্ত্রপাতি আছে। এগুলো ওরা ভূগর্ভে পাঠিয়ে দেবে। ওরা নিজেরা মহাকাশযানে উঠে বেশ কিছু দূরে গিয়ে ভূগর্ভের যন্ত্রকে নির্দেশ পাঠাবে। তারপর কী হবে জানো?"

আংটি সভয়ে বলল, "কী হবে?"

"ওই যন্ত্রগুলোর প্রভাবে পৃথিবী নিজেই কক্ষচ্যুত হয়ে ওদের মহাকাশযানের নির্দেশমতো চলতে শুরু করবে এক নির্বাসনযাত্রায়।"

"উরেব্বাস!"

"ভয় পেও না। আমি এখনও আছি। এ-ঘটনা এত সহজে ঘটতে দেব না। তবে তোমাদের সাহায্য চাই।"

(ক্রমশ)

আমূল মাখন
ফুর্তিতে টইটম্বুর
পুষ্টিতে আ-মূল ভরপুর
সোনার বরণ আমূল মাখন মোলায়েম ও মজাদার, ফুর্তি ও পুষ্টির সোনার ভাণ্ডার। খাঁটি দুধের স্বাভাবিক গুণে ভরা, প্রোটিনে সমৃদ্ধ, স্বাদে খাসা। তার সঙ্গে এতে ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' রয়েছে, ফলে বাড়ন্ত বাচ্চার যা যা দরকার, এতে তার সবই আছে।
বাচ্চাদের প্রতিদিন আমূল মাখন দিন। জানেন তো, এই চকম্-চকম্ মাখনের ভুরভুরে স্বাদ বাচ্চাদের কি দা-রু-ণ পছন্দ!
ফুর্তিভরা চাকম্ চাকম্ মাখন
বিক্রীব্যবস্থায়ঃ
গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড
পোষ্ট বক্স ১০, আনন্দ ৩৮৮ ০০১, গুজরাট।
OPERATION FLOOD
daCunha/A/277/85 BN.

সম্পূর্ণ উপন্যাস

রক্তাক্ত ওয়াটার্লু

বাণীব্রত চক্রবর্তী

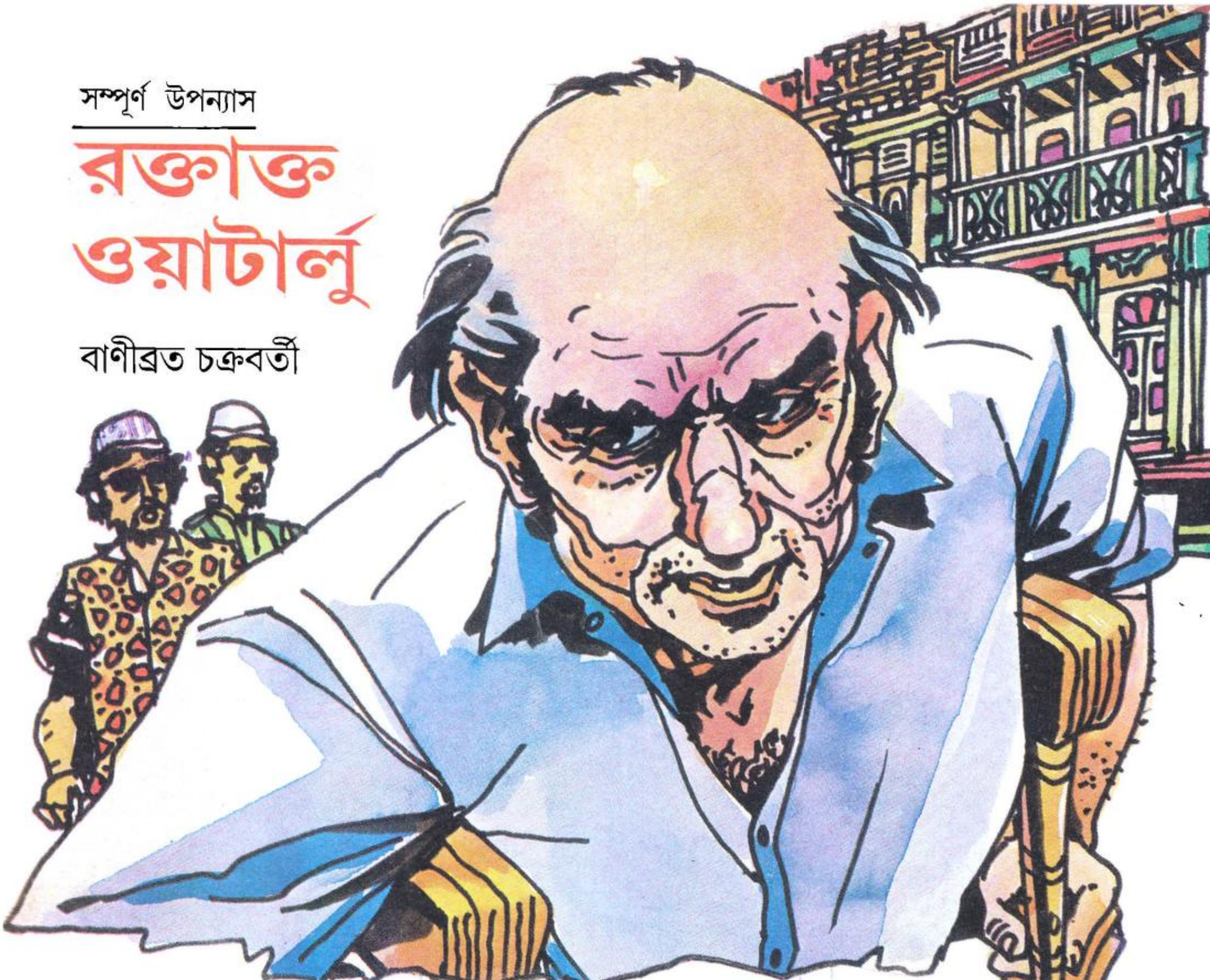

আজকের কাগজে 'ব্যক্তিগত' কলমে ছোট একটি বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। সকালবেলায় চা খেতে খেতে সাত্যকি কাগজ পড়ছিল। শুধু খবর নয়, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে বিজ্ঞাপনগুলিও পড়ে : দ্বিতীয় পৃষ্ঠার এই বিজ্ঞাপনটা সে বার বার পড়ল। পড়তে-পড়তে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সাত্যকি উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়াল।

সামার ভ্যাকেশন্ সবে শুরু হয়েছে। হিসেবমতো হাতে রয়েছে মাসখানেক ছুটি। সাত্যকির মতন স্কুল-শিক্ষকদের এটাই তো পরম লাভ। মা আর অবাক হন না। বাবা-কাকারাও অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। একমাত্র মধুই যা মুখ ফশকে বলে ফেলে, "দাদাবাবু যেন কেমন। কী ভূত যে দাদাবাবুর ঘাড়ে চেপেছে।"

ভূত ? হ্যাঁ, ভূতই। ভূত ছাড়া একে অন্য কিছু বলা যায় না।

সেদিন দুপুরে সাত্যকি নিজের ঘরের খাটে গা এলিয়ে শুয়ে ছিল। শুয়ে শুয়ে অতীতের কথা ভাবছিল।

বাদুড়বাগানে সাত্যকিদের বাড়ির সামনে মল্লিকদের বাড়ি। মল্লিকদের বিশাল বাড়িটার অবস্থা এখন শোচনীয়। প্রেতপুরীর মতন ওই বাড়িটায় থাকেন মঘা মল্লিকের নাতি বৃদ্ধ ফড়িং মল্লিক, আর তাঁর কাজের লোক নাটু।

নাটু বাবুর দেখাশোনা করে। বাবুর একটি মোটর আছে। সাবেককালের গাড়ি। এই মডেলের অস্টিন কলকাতায় খুব বেশি নেই। সেই গাড়িটি, ফড়িংবাবু আর নাটুকে নিয়ে এখন মল্লিক-পরিবার টিকে আছে। নাটু সেই সাবেককালের অস্টিনটি চালায়। মাঝে-মাঝে সন্ধেবেলায় সে বাবুকে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যায়। কিন্তু অনেক-অনেককাল আগে যখন মঘা মল্লিক এই বাদুড়বাগানে বসবাস শুরু করেননি, তখন এখানে ছিল একটা জলা আর সেটাকে ঘিরে ধোবাদের বস্তি। সাত্যকিদের এই বাড়িটির ঠিক পিছনের পার্কটা আগে ছিল একটা পুকুর। সাত্যকি বিছানা ছেড়ে উঠল। টেবিলের উপর আজকের কাগজটা পড়ে আছে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ব্যক্তিগত কলমে ছোট্ট বিজ্ঞাপনটির চারপাশে লাল কালি দিয়ে একটা বর্গক্ষেত্র এঁকে দিল।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ ওয়াটার্লু স্ট্রিট ধরে এক যুবককে হনহন্ করে হাঁটতে দেখা গেল। সে সাত্যকি। রাস্তার দু'পাশের দিকে তাকিয়ে সে কিছু একটা খুঁজছিল। একটা ছোট দোতলা বাড়ির দিকে চোখ পড়তেই তার মুখের ভাব পালটে গেল। এতক্ষণ ধরে সে যা খুঁজছিল, তা পেয়েছে। এরকম জায়গায় এমন দোকান বেমানান। সাত্যকি ফুটপাথ বদলে নিল।

এখন সাত্যকি পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কোল্ড ড্রিংক খাচ্ছে। উলটোদিকে সেই দোতলা বাড়ি। একতলায় ঝিনুক ও শাঁখের গয়নার একটা দোকান। ওই দোকান থেকে একটু পরে একটা লোক বেরিয়ে এল। লোকটার মাথায়

টাক। গায়ে পাঞ্জাবি, পরনে পায়জামা। লোকটার একটা পা নেই। দু বগলে ক্রাচ। লোকটা দোকান থেকে বেরিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে চারদিক দেখল। তারপর আস্তে-আস্তে ডালহৌসির দিকে হাঁটতে শুরু করল। ঠাণ্ডাপানির দাম মিটিয়ে সাত্যকি কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দেখতে দেখতে খোঁড়া লোকটা মানুষের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। সাত্যকি ফুটপাথ বদল করল। মনে হল, এবার সে ওই শৌখিন গয়নার দোকানটাতে ঢুকবে। সাত্যকি কিন্তু দোকানটাতে ঢুকল না। হাঁটতে-হাঁটতে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের গাড়িবারান্দার নীচে এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আচমকা একটা ভিড়-বাসে উঠে পড়ল।

॥ দুই ॥

"বগলাচরণ ছিপ হাতে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন। দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে গেল। নাহ্, আজ একটাও মাছ পাওয়া গেল না। সাজসরঞ্জাম ব্যাগে ভরে উঠব-উঠব করছেন, এমন সময় পিছন থেকে কেউ যেন তাঁকে ডাকলেন। যে লোকটি তাঁকে ডাকছিলেন, তাঁকে দেখে বগলাচরণ চমকে উঠলেন। টোপা মিত্তির। রাস্তায় গ্যাসের ম্রিয়মাণ আলো টোপা মিত্তিরের মুখের উপর পড়েছে। উনি হাতছানি দিয়ে ডাকলেন, 'বগলাচরণ, এদিকে এসো।' তখন বাড়িতে-বাড়িতে শাঁখ বেজে উঠছে।

"টোপা মিত্তিরকে নিয়ে বগলাচরণ বাড়িতে এলেন। সুকিয়া স্ট্রিটের উপরেই তাঁর বাড়ি। বগলাচরণ সরকার মার্চেন্ট অফিসের কেরানি। বৈঠকখানায় চৌকি পাতা। কাজের লোক এসে বাতি দিয়ে গেছে। দুই বন্ধু মুখোমুখি বসলেন। কাজের লোক তামাক নিয়ে এল। টোপা মিত্তির তামাক খান না। খাবার এল। কাঁসার রেকাবিতে মিষ্টি ও পাথরের গেলাসে বেলের পানা।"

অংশু থামল। সাত্যকিকে সিগারেট এগিয়ে দিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "কেমন লাগছে?"

সাত্যকি অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষণ সিগারেট টানল, তারপর বলল, "গল্প তুমি ভাল বলতে পারো। কিন্তু, অংশু, গল্প শুনে তো আশ মিটবে না। যতক্ষণ এর ভেতর থেকে খাঁটি জিনিসটা না পাচ্ছি, ততক্ষণ স্বস্তি নেই।"

অংশু হাসল। বলল, "দ্যাখো, বলতে গেলে একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে নিতেই হয়। বগলাচরণ তামাক খেতেন নাকি টোপা মিত্তির খেতেন, তা আমি জানি না। সেদিন বগলাচরণের বাড়িতে টোপা মিত্তির পাথরের গেলাসে সত্যি বেলের পানা খেয়েছিলেন কি না, এ-ব্যাপারে যদি সন্দেহ করো, করতে পারো। তবে আসল ঘটনায় কিন্তু কোনও খাদ নেই।"

অংশু গল্প বললে এইভাবেই বলবে। বগলাচরণের প্রপৌত্র অংশুমান সরকার শুধু যে গল্প লেখে তা নয়, বাসও করে বইয়ের রাজ্যে। কলকাতায় যে-ক'টা নামকরা লাইব্রেরি আছে, তার মধ্যে গ্রন্থভবনও একটা। অংশু এখানকার লাইব্রেরিয়ান। আর মাঝে-মাঝে এখানে-ওখানে গল্প-টল্প লেখে। বগলাচরণের সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়ি এখন নেই। সেখানে আর-পাঁচটা বাড়িও লুপ্ত। ওই জমিতে এখন বিস্কুটের কারখানা। অংশু লেক প্লেসের এই বাড়িতে দিব্যি আছে। দাদা-বউদি ভাইপো-ভাইঝিদের নিয়ে আনন্দে আছে। এটা অংশুর ঘর। কয়েক দিনের ছুটি নিয়েছে অংশু।

সাত্যকি বলল, "নাও, থামলে কেন, শুরু করো।"

অংশু আবার শুরু করল, "বেলের পানা ও মিস্টি শেষ করে টোপা মিত্তির বললেন, 'তোমাকে নিতে এসেছি বগলা।' বগলাচরণ চমকে উঠলেন, 'আমাকে! আমাকে আবার কেন?' এই কথায় টোপা মিত্তির অট্টহাস্য করে উঠলেন। তারপর ধীর গলায় বললেন, 'তুমি না গেলে হবে না। ভয় কী? মোটে তো এক মাসের ব্যাপার। তা এক মাসের জন্যে তোমার সংসারের একটা বন্দোবস্ত করে দিয়ে যাব। খরচপত্রের কথা ভেবে চিন্তা কোরো না।' বগলাচরণ বললেন, 'কিন্তু আমার আপিস?' টোপা মিত্তির কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। তারপর পকেট থেকে পানের ডিবে বার করে দু' খিলি পান মুখে পুরলেন। আঙুলে চুন তুলে জিবে ঠেকালেন। তারপর আড়মোড়া ভেঙে বললেন, 'সায়েবের কাছে ছুটির দরখাস্ত করো। যদি ছুটি দেয় তো ভাল। নইলে চাকরি ছেড়ে দিও।' টোপা মিত্তির বুক-পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখলেন। অবশেষে 'আজ আসি' বলে বিদায় নিলেন। বগলাচরণ হতভম্বের মতন চৌকির উপর বসে রইলেন।"

॥ তিন ॥

রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর সাত্যকি ছাদে পায়চারি করছিল। সামনে মল্লিকদের বিশাল বাড়িটা ভুতুড়ে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

যা প্রাচীন ও অতীত, তা সাত্যকিকে কেমন যেন উশকে দেয়। অতীত ও বর্তমানের ভিতর একটা যোগসূত্র থেকে যায়। তার ভিতর নিহিত থাকে রহস্য। অংশুর কথা যদি সত্যি হয় তা হলে মল্লিকদের পূর্বপুরুষও এই রহস্যের সঙ্গে জড়িত।

বগলাচরণ সাহেবের কাছে ছুটির আবেদন করেছিলেন। না পেয়ে চাকরিতে ইস্তফা দেন। কেন? টোপা মিত্তিরের সঙ্গে তিনি কোথায় গেলেন? কোন্ অমূল্যের সন্ধান তাঁরা পেয়েছিলেন? টোপা মিত্তিরের না-হয় সংসার-টংসার ছিল না। বগলাচরণের সংসার ছিল। তখন অংশুর পিতামহ কমলাপ্রসাদের বয়স বাইশ। তাই সংসারটা ভাসল না, এই রক্ষে।

খবরের কাগজের ওই একলাইনের বিজ্ঞাপনটি সাত্যকির মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। সাত্যকির প্রথম রহস্য-উন্মোচন সিংহবাহিনীর মূর্তিকে কেন্দ্র করে। সূত্রটি পেয়েছিল পিতামহ দশরথ দত্তের ডায়েরি থেকে। সাত্যকি মূর্খ হরিণের গল্প জানে। হরিণ পাগলের মতন অরণ্য তোলপাড় করে ছুটছে। তীব্র গন্ধে সে আত্মহারা। কোথা থেকে এই গন্ধ আসছে? মূর্খ হরিণ জানে না এ-গন্ধ রয়েছে তার নাভিতেই।

সাত্যকি ক্লাসে ছেলেদের কাছে প্রায়ই এই গল্পটা বলে। হয়তো ক্লাস টেনের মৈনাক জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, আলফ্রেড নোবেলের ওপর একটা রচনা লিখব। তাঁর জীবনী কোথায় পাব?' সাত্যকি ওকে জিজ্ঞেস করে, 'বাড়িতে সুকুমার রায়ের রচনাসমগ্র আছে?' মৈনাক বুঝতে পারল না স্যার এই প্রশ্নটা করলেন কেন। মৈনাক বলল, 'আছে।' সাত্যকি তখন ক্লাস

টেনের ছেলেদের মূর্খ হরিণের গল্পটা বলল। পরিশেষে বলল, 'মূর্খ হরিণ জানে না তার নাভিতেই কস্তুরী আছে। আর এই কস্তুরী থেকেই সৌরভ আসছে। মৈনাক, তোমার কাছেই নোবেলের জীবনী আছে।'

মৈনাক অবাক, 'আমার কাছে?' সাত্যকি বলল, 'হ্যাঁ। সুকুমার রায়ের রচনাসমগ্রেই পাবে।'

সাত্যকি নিজের দিকে তাকিয়ে ওই এক সত্য টের পায়। তার কাছাকাছি কত গভীর রহস্য সুপ্ত হয়ে আছে।

বিস্কুটের কারখানার মাটিতে বগলাচরণের স্মৃতির কোনও চিহ্ন না থাক, অংশুরা থাকত কাছাকাছি। আবার বিদ্যাসাগর স্ট্রিটের সে বাড়িও কবে বিক্রি করে দিয়ে অংশুরা লেক প্লেসে উঠে গেছে। কিন্তু সাত্যকির সঙ্গে বাল্যবন্ধু অংশুর ছাড়াছাড়ি হয়নি। সিংহবাহিনীরহস্যের সাফল্যে অংশু সাত্যকির জন্যে গর্ববোধ করেছে। অংশু বলেছে, 'আমি গল্পে লিখি ঠিকই। তবে মিস্ট্রি আর অ্যাডভেঞ্চার আমার কলমে আসে না। তা হলে তো তোমাকে টোপা মিত্তির আর বগলাচরণের গল্পটা বলতে হয়।'

ছাদ থেকে সে ঘরে ফিরে এল। টেবিলে পেপারওয়েটের নীচে খবরের কাগজটা আছে। সাত্যকি কাগজটা টেনে নিল। লাল বর্গক্ষেত্রের ভিতর জ্বলজ্বল করছে কটি কথা :

ওয়াটার্লুর রণক্ষেত্রে নেপোলিয়ান এসেছেন

আজ কত রাতে যে ঘুম আসবে কে জানে। সাত্যকি বিছানায় চুপচাপ শুয়ে রইল। অংশুর গল্পটা চোখের সামনে ছায়াছবির মতন ভেসে উঠল।

মেছোবাজারে টোপা মিত্তির থাকতেন। বগলাচরণ সুকিয়া স্ট্রিটে। টোপা মিত্তিরের যা পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, তাতে তাঁর দিব্যি চলে যেত। মানুষ বলতে তো তিনি একাই। ভদ্রলোক জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ থেকে বি.এ. পাশ করেছিলেন। আর ছিল ভ্রমণের শখ। ভারতের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ঘুরে বেড়াবার তখন তেমন সুযোগ ছিল না। যতটুকু সুবিধে ছিল, ততটুকু ব্যবহার করেছিলেন। ভ্রমণই হল তাঁর কাল। সেবার কোথায় গিয়েছিলেন কেউ জানে না। সম্ভবত বগলাচরণ জানতেন। টোপা মিত্তির একদিন অতর্কিতে ফিরে এলেন, তারপর বগলাচরণকে নিয়ে উধাও হলেন।

এই রহস্যের দ্বিতীয় পর্ব মল্লিক-পরিবারকে কেন্দ্র করে।

ফড়িং মল্লিকের পিতামহ মঘা মল্লিক শেষ-বয়সে ধোবাদের জমি কিনে বাড়িটি করেন। তাঁর ছিল সোনার কারবার। অংশু শুনেছে মঘা মল্লিকের কাছে একদিন এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আসেন। মঘা মল্লিক তাঁকে সমাদরে গৃহে স্থান দেন। কিন্তু তিনদিন বাদে সন্ন্যাসীর হদিস মেলেনি। লোকে বলে সে-সন্ন্যাসী আর কেউ নন, স্বয়ং টোপা মিত্তির। অংশুর পিতামহ কমলাপ্রসাদও এ-ব্যাপারে একমত। কিন্তু কোথায় গেলেন বগলাচরণ? সন্ন্যাসী যদি টোপা মিত্তির হন তা হলে প্রশ্ন থেকে যায়। কী জন্যে এতকাল বাদে তিনি ফিরে এসেছিলেন?

এর পর মঘা মল্লিকের ভাগ্য পরিবর্তন লক্ষ করার মতন। ছোট্ট বাড়িটি ক্রমশ অট্টালিকা হয়ে উঠল। মঘা মল্লিক দেখতে দেখতে ধনী সমাজের একজন কেউকেটা হয়ে উঠলেন। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই মঘা মল্লিক মারা যান। ফড়িং মল্লিকের বাবা তারা মল্লিক কলকাতায় প্রথম যাঁরা মোটরগাড়ি কেনেন তাঁদের মধ্যে একজন। সেকালে এই গাড়িকে বলা হত হাওয়া গাড়ি।

॥ চার ॥

সাত্যকি মট লেনের পোস্ট অফিস থেকে ধর্মতলা স্ট্রিটে এসে দাঁড়াল। আকাশে মেঘ ছিল। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। পুরনো বইয়ের দোকানের পাশে রেকর্ডের দোকান। কার গান বাজছে? বেগম আখতার?

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। সাত্যকি ওয়াটার্লু স্ট্রিটে যাবে বলে বিকেল বিকেল বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। প্রথমে গিয়েছিল কলেজ স্ট্রিটে। মজুমদারমশাইয়ের পুরনো বইয়ের দোকানে। অনেকদিন পরে সাত্যকিকে দেখে ভদ্রলোক ভারী খুশি। এখানে কয়েকখানা বই থেকে পুরনো কলকাতা সম্পর্কে কিছু তথ্য জোগাড় করা গেল। সাত্যকির কাঁধে ঝোলা। ঝোলাতে দরকারি অ-দরকারি জিনিস ও নোটবুক। মজুমদারমশাই যোগেনকে দিয়ে লেবু-চা আনিয়েছিলেন। চা খেতে-খেতে বইগুলি থেকে কিছু তথ্য নোট করে নিয়েছিল। তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে ট্রামে উঠেছিল। প্রথমে একবার ধর্মতলায় যাবে এমন ইচ্ছে ছিল।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, গড়ের মাঠ শহুরে মানুষের চোখে শ্যামলতা ও স্নিগ্ধতা দেয়। সেই গড়ের মাঠ এখন কোথায়? তবু ছিটেফোঁটা সবুজ তো আছে। চিন্তাগ্রস্ত সাত্যকি তাই

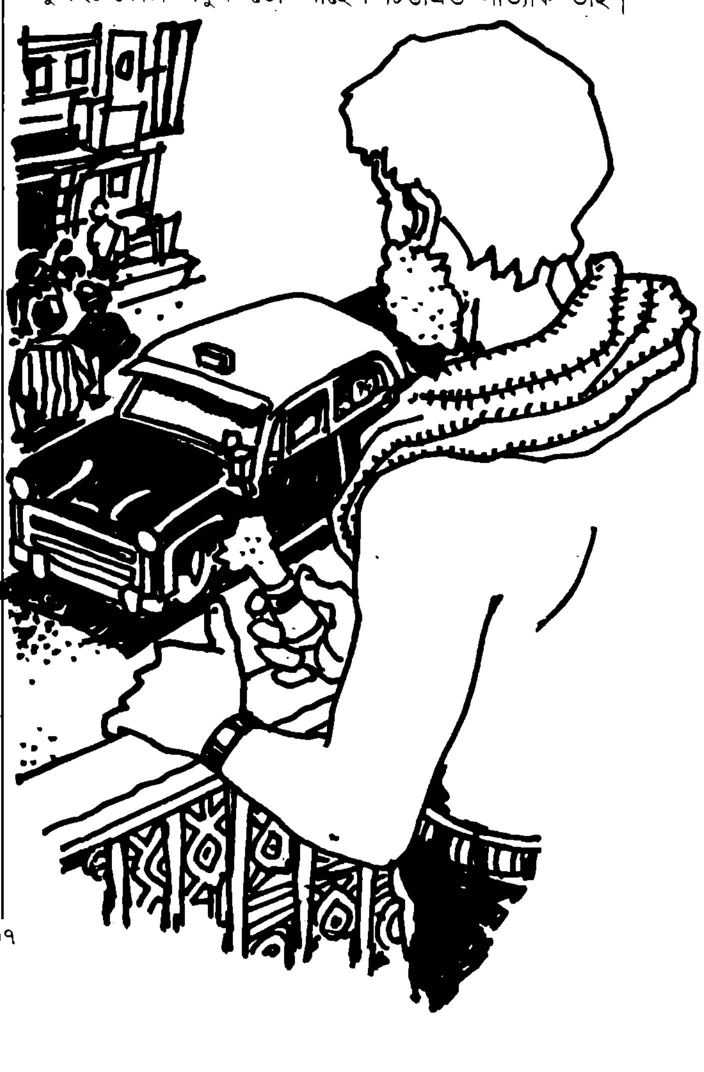

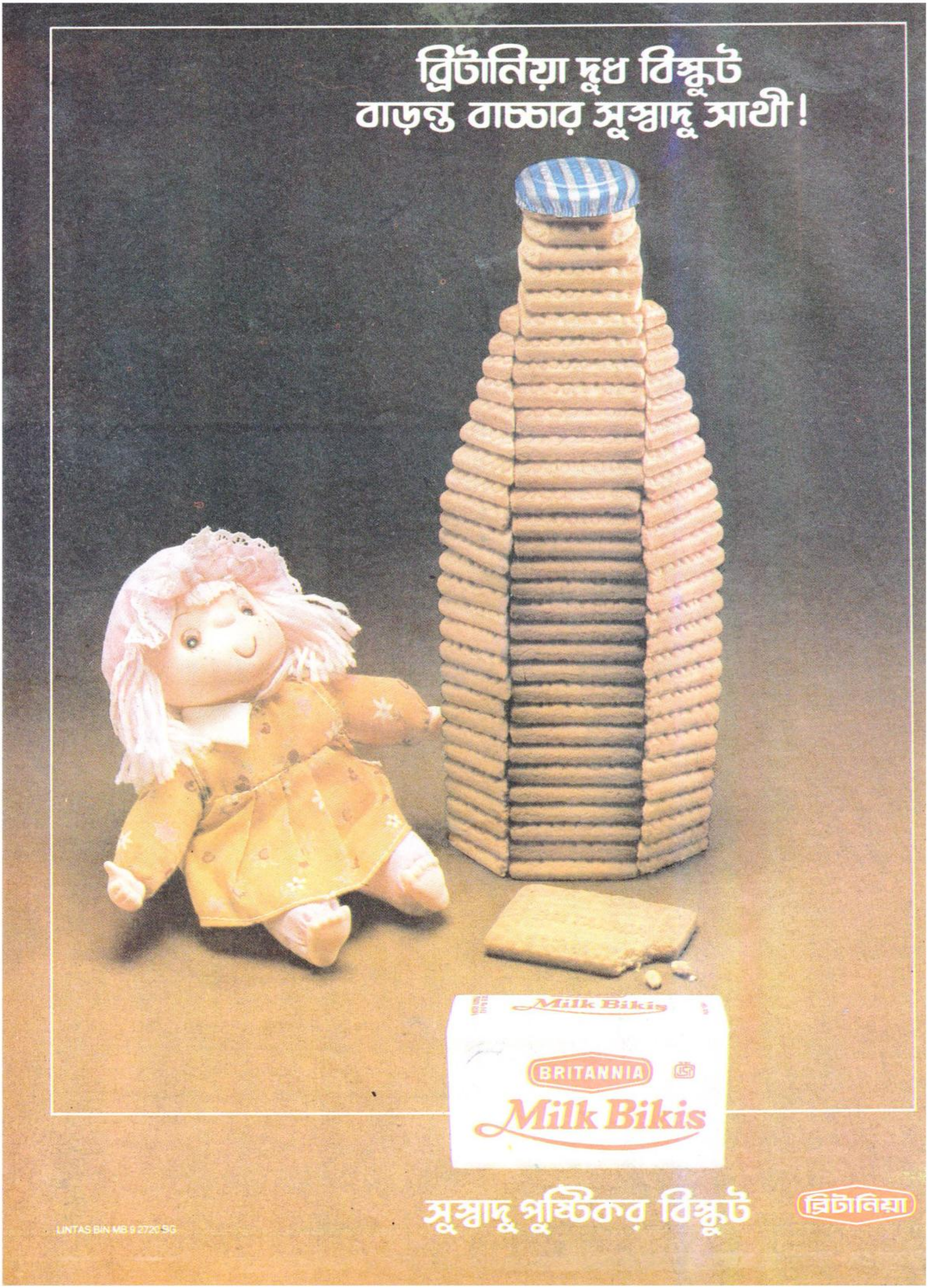

ব্রিটানিয়া দুধ বিস্কুট
বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী!
Milk Bikis
BRITANNIA
Milk Bikis
সুস্বাদু পুষ্টিকর বিস্কুট
ব্রিটানিয়া
LINTAS BIN MB 9 2720 BG

মাঝে-মাঝে গড়ের মাঠে চলে যায়। মাঠের উপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ে। চোখের সামনে সমুদ্রের মতন আকাশটা ভাসতে থাকে।

ওয়াটার্লুর রহস্য অতীত এবং বর্তমানকে পাকে-পাকে জড়িয়ে ফেলেছে। সমস্ত ব্যাপারটা এমন জটিল হয়ে উঠেছে যে, তার সূত্রগুলি মেলাবার জন্যে অবকাশ চাই। জট খোলার জন্যে নির্জন অবসর চাই। তাই সাত্যকি যাচ্ছিল গড়ের মাঠে। তখন আকাশের এক কোণে একটুকরো মেঘ ছিল। সাত্যকি ভ্রূক্ষেপ করেনি। ট্রামে বসে তার মনে হল এখন অংশুকে দরকার। তাই ওয়েলিংটন পেরোতেই ঝপ্ করে ট্রাম থেকে নেমে পড়েছিল সাত্যকি। মট লেনের পোস্ট অফিস থেকে যদি অংশুকে একটা ফোন করা যায়! অংশু কয়েকদিনের ছুটি নিয়েছে। ও বাড়িতেই আছে। কিন্তু ফোন পাওয়া গেল না। তারপরেই বৃষ্টি।

সাত্যকি ভাবল এক ছুটে ওপারে চলে যাই। এখনও রেকর্ডের দোকানে গান শোনা যাচ্ছে। দোকানের তেরপলের নীচে মানুষের ভিড়। মাথাও বাঁচানো যাচ্ছে, গানও শোনা হচ্ছে। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে সাত্যকি চমকে উঠল। সেই খোঁড়া লোকটা। মাথায় টাক। গায়ে আজ নীল জামা। পরনে কালো প্যান্ট। সাত্যকি লোকটাকে আরও ভাল ভাবে দেখতে চাইল। পারল না। কেননা, তখন সাত্যকির চোখের সামনে সার-সার বাস ট্রাম মোটর। মিনিটখানেক বাদে গাড়ির মিছিল হালকা হয়ে গেল বটে, কিন্তু সে লোকটাকে আর খুঁজে পেল না। বৃষ্টিও ধরে গেল। নাহ্, অংশুকে তার চাই। তারপর ওয়াটার্লু স্ট্রিট।

একটা সাইকেলের দোকান থেকে অংশুকে ফোন করে বলল, "বাড়িতে থাক। আমি যাচ্ছি।"

সাত্যকি চৌরঙ্গির দিকে হাঁটতে শুরু করল। ওখান থেকে বাসে উঠতে হবে। কিংবা যদি শেয়ার-ট্যাক্সি পাওয়া যায়। হাঁটতে-হাঁটতে তীক্ষ্ণভাবে চারদিকে তাকাচ্ছিল। কিন্তু কোথায় সেই খোঁড়া লোকটা!

নেপোলিয়ান আর কেউ নয়। নেপাল মুতসদ্দি। অংশুর গল্পে এঁর ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ।

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। এক রবিবার সকালে অংশুদের বাড়ির নীচে মোটরের হর্ন শোনা গেল। অংশু বারান্দায় দাঁড়িয়ে শেভ করছিল। মুখ বাড়িয়ে নীচে তাকিয়ে দেখল, ওদের বাড়ির সামনে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সি-ড্রাইভার হর্ন বাজাচ্ছে। ব্যাপার কী! গাড়ির জানলা দিয়ে এক ভদ্রলোক মুখ বাড়িয়ে অংশুকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

গায়ে জামা গলিয়ে অংশু নীচে গেল। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি অংশুমান সরকার?' অংশু মাথা নেড়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ।' ভদ্রলোকের মুখে একটাও দাঁত নেই। মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া কালো চুল। বয়স বছর চল্লিশ হবে। উনি এবার বলেছিলেন, 'আমার নাম নেপাল মুতসদ্দি। বাতে পঙ্গু। গাড়ি থেকে নামতে পারছি না। অথচ আপনার সঙ্গে আমার ভারী দরকার।'

ভদ্রলোক অংশুকে ট্যাক্সিতে উঠে আসতে বলেছিলেন। অংশু ট্যাক্সিতে উঠেছিল। ট্যাক্সি লেক গোলপার্ক গড়িয়াহাটে এক চক্র ঘুরেছিল। অংশু সেই প্রথম একটি লোকের খোঁজ পেল, যিনি বগলাচরণ সরকার সম্পর্কে আগ্রহশীল।

অংশু বলেছিল, 'উনি আমার প্রপিতামহ ছিলেন। তবে ওঁর সম্পর্কে আমি তেমন কিছুই জানি না।'

নেপালবাবুর মুখে বাঁকা হাসি ফুটে উঠেছিল। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বগলাচরণ সরকারের অন্তর্ধানের খবরটাও কি জানেন না?'

অংশু বিরক্ত হয়, বলে, 'আপনি কী জানতে চান বলুন তো?'

নেপালবাবু দুঃখিত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। জানবেন আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী। আচ্ছা, আপনাদের বাড়িতে বগলাচরণ সরকারের কোনও লেখাটেখা আছে?'

অংশু এমন প্রশ্নে অবাক হয়েছিল, জিজ্ঞেস করেছিল, 'তার মানে?'

এবার নেপালবাবু স্পষ্টভাবে একটা কথাই জানতে চাইলেন, 'বগলাচরণের হস্তাক্ষর কি আপনি চেনেন?'

না বললে মিথ্যে বলা হয়। প্রপিতামহের একটি খাতা অংশু উদ্ধার করেছে। গানের খাতা। অযোধ্যানাথ পাকড়াশি, ত্রৈলোক্য সান্যালের লেখা গান তিনি টুকে রেখেছিলেন। সে-খাতা উলটে দেখা অংশুর স্বভাব। কতকাল আগে একটি মানুষ পরম যত্নে কিছু ভক্তিগীতি এখানে টুকে রেখেছেন। যে মানুষটা সম্পর্কে একটি দুর্জ্ঞেয় রহস্য আজও বর্তমান। অংশু বলেছিল, 'তাঁর হাতের লেখা আমি চিনি।'

তারপরই নেপালবাবু পকেট থেকে একটা ডায়েরি বার করেছিলেন। ডায়েরির ভিতর থেকে একটি বিবর্ণ কাগজ বার করে অংশুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'দেখুন তো, এই হাতের লেখাটা কি বগলাচরণ সরকারের, নাকি অন্য কারও।'

অংশু স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, এ তো তাঁরই হাতের লেখা। অংশু মাথা নেড়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ, এ হাতের লেখা বগলাচরণ সরকারের।'

কাগজটিতে রহস্যময় সাংকেতিক ভাষায় কিছু লেখা ছিল। কিন্তু এক লহমায় কাগজটি দেখেছিল বলে পরে তার কিছুই মনে ছিল না। নেপাল মুতসদ্দি অংশুকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

॥ পাঁচ ॥

চতুর্দিকে খাঁখাঁ করছে। ফুটপাথেও মানুষ ঘুমোচ্ছে। সমস্ত দোকানপাট অফিস ব্যাংক সব বন্ধ। রাস্তায় গাড়িঘোড়ার চিহ্ন নেই। শুধু গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের গাড়িবারান্দার নীচে দুটো লোক চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনের চোখে কালো চশমা। মাথায় ফেজ টুপি। শস্তা ছিটের জামা ও ঢলঢলে প্যান্ট পরেছে। দু'জনের হাতে সাদা লাঠি। এবার লোক দুটিকে উত্তরের দিকে হাঁটতে দেখা গেল। পথের একটা কুকুর ওদের দেখে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। অন্ধ লোক দুটি সন্তর্পণে লাঠি ঠুকে-ঠুকে হাঁটছে। এবার ওরা দু'জন ডান দিকে বাঁক নিল। ওয়াটার্লু স্ট্রিট। এখানে এসে দু'জন কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। তারপরই দু'জন ধীরস্থির কণ্ঠে গান শুরু

করল। মধ্যরাত্রে দুটি অন্ধ গান গাইতে গাইতে ওয়াটার্লু স্ট্রিট ধরে হেঁটে যাচ্ছে। এমন সময় উলটো দিক থেকে একটি মোটরকে আসতে দেখা গেল। মোটরটি কালো রঙের পুরনো মডেলের অস্টিন। গাড়িটি নিঃশব্দে একটা দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়াল। বাড়িটির একতলায় ঝিনুক ও শাঁখের গয়নার দোকান। অন্ধ দুটি গান গাইতে গাইতে এগিয়ে যাচ্ছে। গাড়ি থেকে একজন খোঁড়া লোক নামল। দুটো ষণ্ডামতন লোক একজন বুড়ো মানুষকে ধরে-ধরে নামাল। অন্ধ দুটি লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে অনেক দূর চলে গেছে। খোঁড়া লোকটা বাড়িটার বন্ধ দরজায় তিনটে টোকা দিল। দরজা খুলে গেল। বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল লোকটা। মোটরগাড়িটিও স্টার্ট নিল এবং দেখতে-দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিছুদূরে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে অন্ধ লোক দুটি দাঁড়িয়ে ছিল। একজনের চোখে কালো চশমা। অন্যজনের চোখে চশমা নেই। সেই লোকটির চোখে দূরবিন। দূরবিন দিয়ে দেখতে-দেখতে লোকটি বলল, "গাড়ির নাম্বার টুকে নাও।"

অন্য লোকটি চোখ থেকে কালো চশমা খুলল এবং পকেট থেকে ডায়েরি বার করে নাম্বারটি টুকে নিল।

॥ ছয় ॥

ফড়িং মল্লিককে পাওয়া যাচ্ছে না।

সন্ধের দিকে তিনি মাঝে-মাঝে নিজের গাড়িতে বেড়াতে বেরোতেন। গাড়ি চালায় নাটু। এখন তো নাটুই সব। বাবুর দেখাশোনা করা, এমন কী রান্নাবান্না পর্যন্ত।

ফড়িং মল্লিক রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর নাটুকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। আর ফেরেননি। ফিরেছে নাটু। গাড়িও উধাও।

সকালবেলায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে সাত্যকি চা খাচ্ছিল। গলিতে পুলিশের জিপ ঢুকল। তার মধ্যে পুলিশ-অফিসার সূর্য। সূর্যকে দেখে সাত্যকি খুশি হল, কিন্তু অবাক হল না।

সূর্য মুখ তুলে উপরের দিকে তাকিয়ে বলল, "সতু, একবার নীচে আয়।"

গায়ে পাঞ্জাবি গলিয়ে সাত্যকি নীচে নামল। সূর্যকে বলল, "ফড়িং মল্লিককে পাওয়া যাচ্ছে না তো?"

সূর্য অবাক। সাত্যকি জানল কী করে? নাটুকে এখনও থানায় আটকে রাখা হয়েছে। সূর্য বলল, "ও, তবে ব্যাপারটা দেখছি সকলেই জেনে ফেলেছে।"

সাত্যকি হাসল, "ভয় নেই, আমি ও আর একজন ছাড়া কেউ জানে না। অবশ্য নাটুর কথা বাদ দিচ্ছি।"

ফড়িং মল্লিকের বিশাল বাড়িটাকে এখন ভগ্নস্তূপ বললে ঠিক বলা হয়। গাড়ির কোনও গ্যারাজ ছিল না। শতচ্ছিন্ন তেরপল দিয়ে গাড়িটা ঢাকা থাকত। সদরের দরজাটা বন্ধ করা যায় এই রক্ষে। নাটু কাল রাতে বাবুকে নিয়ে লোহার গেটে তালা লাগিয়ে বেরিয়েছিল। সূর্য চাবি এনেছিল। ওরা বাড়ির ভিতর ঢুকল।

বেশিরভাগ ঘরে তালা। কত ঘর ভেঙে গেছে। সূর্য বোধহয় নাটুর কাছ থেকে ফড়িং মল্লিকের ঘরের হদিস জেনে এসেছিল। ঘরটি বাইরে থেকে শিকল তোলা। শিকল খুলে ওরা ঘরটায় ঢুকল।

ঘরের অর্ধেক জুড়ে আছে সেকালের পালঙ্ক। কাচের আলমারিতে নানান রকম পুতুল। দেওয়ালে একটা ক্ল্যারিওনেট ঝুলছে। জানলার ধারে পাথরের টেবিল। টেবিলের কাছে গিয়ে সাত্যকি চমকে উঠল। সেদিনকার খবরের কাগজের সেই পৃষ্ঠা। ব্যক্তিগত কলমে একটি বিজ্ঞাপনের নীচে সবুজ কালির আঁচড়:

ওয়াটার্লুর রণক্ষেত্রে নেপোলিয়ান এসেছেন

সূর্য বলল, "তা হলে চল ওয়াটার্লু স্ট্রিটে যাই।"

সাত্যকি হেসে ওঠে। সূর্য বলল, "কী হল, তুই হাসছিস কেন?"

"দ্যাখ সূর্য, ইতিহাসের নেপোলিয়ানের বুদ্ধি ছিল এবং বীরত্বও ছিল। এই নেপোলিয়ানের ধূর্ততা আছে।"

"তবু সাত্যকি, ওয়াটার্লুতে একবার যেতেই হবে।"

ওরা যখন ওয়াটার্লু স্ট্রিটে পৌঁছল তখন সেখানে রীতিমত কর্মচাঞ্চল্য, এদিকটাই তো অফিস-পাড়া। জিপ এসে থামল শাঁখের গয়নার দোকানের সামনে। জিপ থেকে নেমে ওরা দোকানটায় ঢুকল। দোকানে কোনও খদ্দের নেই। আট-দশ বছরের একটা ছেলে বসে ঝিনুকের গয়না পরিষ্কার করছিল। আর একটা বুড়ো লোক লাল খেরো-খাতায় একমনে কী যেন লিখছিল। ওদের দেখে দু'জনেই চমকে উঠল। ছেলেটা পুলিশ দেখে ভয় পেয়েছে। দোকানের ভিতর একটা বেঞ্চ পাতা ছিল, তাতে ওরা বসল।

সূর্য জিজ্ঞেস করল, "এ দোকান কি আপনার?"

বুড়ো ভয়ে জবুথবু। মাথা নেড়ে বলল, "আজ্ঞে না।"

সূর্য মাথার টুপি বেঞ্চের উপর রাখল। "এ দোকানের মালিক কে?"

"আজ্ঞে নেপালবাবু।"

"নেপালবাবুটা আবার কে। তাঁর পুরো নাম কী?"

"আজ্ঞে নেপাল মুচ্ছুদ্দি।"

"আপনি এখানে কতদিন কাজ করছেন?"

"আজ্ঞে, গত মাসে ঢুকেছি।"

"আগে কোথায় কাজ করতেন?"

"আমহার্স্ট স্ট্রিটের একটা দোকানে।"

"কোথায় থাকেন?"

"খিদিরপুরের মুনশিগঞ্জে।"

"এ ছেলেটি কে?"

"আমার নাতি নগা।"

"বেশ। নেপালবাবু কোথায় থাকেন?"

"তা তো জানি না।"

"উনি রোজ দোকানে আসেন?"

"আজ্ঞে না।"

"বিক্রি-টিক্রি কেমন?"

"খুব খারাপ। এসব জিনিস তৈরি করতে যা খরচা, তাতে পড়তা পোষায় না। তা ছাড়া এই আপিস-পাড়ায় এসব কে কিনবে বলুন।"

এবার সাত্যকি কথা বলল, "আপনার নাম?"

"আজ্ঞে নারান চিত্রকর।"

সাত্যকি সিগারেট ধরাল। তারপর আবার প্রশ্ন করল, "এটা

তো দেখছি একটা বাড়ি। নীচে এই দোকান। ওপরে কারা থাকে ?"

"সব সময় কেউ থাকে না। মাঝে-মাঝে নেপালবাবু এসে থাকেন। নইলে চাবি দেওয়া থাকে।"

"এই বাড়িটা কি নেপালবাবুর ?"

"অতসব জানি না। আমি সামান্য কর্মচারী বাবু, আদার ব্যাপারী, জাহাজের খোঁজে আমার কী দরকার বলুন।"

সমস্ত ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সেদিন দুপুরে নিজের ঘরে শুয়ে সাত্যকি ঘটনাগুলি সরলীকরণের চেষ্টা করছিল। হঠাৎ কী ভেবে বিছানা ছেড়ে উঠল।

এবার সাত্যকিকে মোটা একটা খাতায় কিছু লিখতে দেখা গেল। আগাগোড়া ব্যাপারটা সে গুছিয়ে লিখে নিচ্ছিল।

সূত্রপাত খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন থেকে। ওয়াটার্লুর রণক্ষেত্রে নেপোলিয়ান এসেছেন। ওয়াটার্লু বললে এখন একটি রাস্তাকে বোঝায়। নেপোলিয়ান বলতে নেপাল মুতসদ্দির কথা মনে পড়েছিল। অনুমান সম্বল করে সাত্যকি সেই রাস্তায় গিয়েছিল। রাস্তার দু'পাশে চোখ রাখতে রাখতে হেঁটেছে। অস্বাভাবিক কিছু যদি চোখে পড়ে। শেষ পর্যন্ত পড়েছিল। ঝিনুক ও শাঁখের গয়নার দোকান। এরকম জায়গায় এমন দোকান কেন। তারপর ওই দোকান থেকে একটা লোক বেরোয়। সেই খোঁড়া লোকটির হাবভাব সন্দেহজনক। অংশুর কাছে সাত্যকিকে যেতে হয়। সরকারবংশের বগলাচরণের অন্তর্ধান-রহস্যটি আবার সে মন দিয়ে শোনে। মেছোবাজারের টোপা মিত্তির একদিন বগলাচরণকে নিয়ে উধাও হন। বহুকাল বাদে টোপা মিত্তির মঘা মল্লিকের বাড়িতে সন্ন্যাসীর বেশে ফিরে আসেন। আবার তিনদিন বাদে সন্ন্যাসীর আর হদিস পাওয়া যায় না। কেউ-কেউ বলেন, মঘা মল্লিক ওই সন্ন্যাসীকে গুমখুন করেছিলেন। তারপর মল্লিকদের অবস্থা ফিরে যায়। এর পর অনেক অনেক বছর কেটে যায়। একদিন নেপাল মুতসদ্দি নামে এক ব্যক্তি অংশুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি বগলাচরণের অন্তর্ধানের কথা জানতেন এবং অংশুকে একটি সাংকেতিক কথা লেখা কাগজ দেখান। অংশু চমকে ওঠে। এ যে তার প্রপিতামহ বগলাচরণের হস্তাক্ষর। তারপর খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন এবং ফড়িং মল্লিকের অন্তর্ধান। অন্তর্ধানের রাত্রে অংশু ও সাত্যকি অন্ধের ছদ্মবেশে ওয়াটার্লু স্ট্রিটে গিয়েছিল। নেপাল মুতসদ্দির দোকানে ফড়িং মল্লিক আসেন তাঁর সেই অস্টিনে। সে-গাড়ি ফড়িং মল্লিককে নামিয়ে চলে যায়। কোথায় ? পরে সূর্য ও সাত্যকি ওই দোকানে যায়। কর্মচারী নারান চিত্রকর আর তার নাতি নগার সঙ্গে দেখা হয়।

॥ সাত ॥

নাটুকে জবাবদিহি করে পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে। নাটু মল্লিক বাড়ির আস্তানায় ফিরে এসেছে। সেদিনের ঘটনা নাটু যা বলেছে, তা যদি সত্যি হয়, তবে ব্যাপারটাকে ঘোরালো বলতে হবে।

সেদিন রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর ফড়িং মল্লিক নাটুকে গাড়ি বার করতে বলেছিলেন। গাড়িতে উঠে ফড়িং মল্লিক বলেছিলেন, 'আজ ইডেন গার্ডেনে চলো।' ইডেন গার্ডেনের

গঙ্গামুখো গেটটায় গাড়ি পার্ক করতে বলেছিলেন। গাড়ি পার্ক করে সে দরজা খুলে বাবুকে নামাতে গিয়েছিল। ফড়িং মল্লিক বলেছিলেন, 'না, নামব না। আমাকে গাড়িতে বসে থাকতে হবে। এক ভদ্রলোক আসবেন। তাঁর সঙ্গে কিছু প্রাইভেট কথা আছে। তুমি বরং ঘণ্টাখানেক কোথাও ঘুরে এসো।' নাটু বলেছিল, 'ঠিক আছে, ঘণ্টাখানেক বাদে আমি আসছি।'

ঘণ্টাখানেক বাদে নাটু ফিরে এসেছিল। কিন্তু কোথায় গাড়ি। বাবুই বা কোথায় ! ফড়িং মল্লিক বৃদ্ধ হয়েছেন। এখন আর ড্রাইভিং করতে পারেন না। নাটু তন্ন তন্ন করে চারপাশটা খুঁজেছিল। এমনকী, ইডেনের ভিতরে ঢুকেও খুঁজেছিল। অবশেষে ক্লান্ত উদ্‌ভ্রান্ত নাটু থানায় গিয়েছিল।

এবার ওয়াটার্লু স্ট্রিটে সাত্যকি একাই যায়। যা ভেবেছিল তাই। দোকান তালা-বন্ধ। ভালভাবে লক্ষ করতে চোখে পড়ল, সাইনবোর্ডটা নেই। সাত্যকি এখন কী করবে ? সূর্যর কাছে যাবে ? নাকি অংশুর কাছে যাবে। সাত্যকি কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। সূর্যকে ফোন করা দরকার। হাঁটতে-হাঁটতে ডালহৌসিতে এল। টেলিফোন-ভবনের পাবলিক বুথ থেকে সূর্যকে রিং করল। সূর্যর সঙ্গে দরকারি কথাবার্তা সেরে ডালহৌসির মোড়ে এসে দাঁড়াল।

মুনশিগঞ্জের ঠিক কোথায় কোন ঠিকানায় নারান চিত্রকর থাকে, তা সে সাত্যকিদের বলেনি। তা হলে এখন কী করা যায় ? আমহার্স্ট স্ট্রিটে সে কোন্ দোকানে কাজ করত ? সেখানে নারান চিত্রকরের হদিস পাওয়া গেলেও পাওয়া যেতে পারে। সাত্যকিকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছিল। সে ঠিক করল,

আপনার শিশুর ভবিষ্যতের বাড়বৃদ্ধি, তার প্রথম বছরের পুষ্টির ওপর নির্ভর করে।

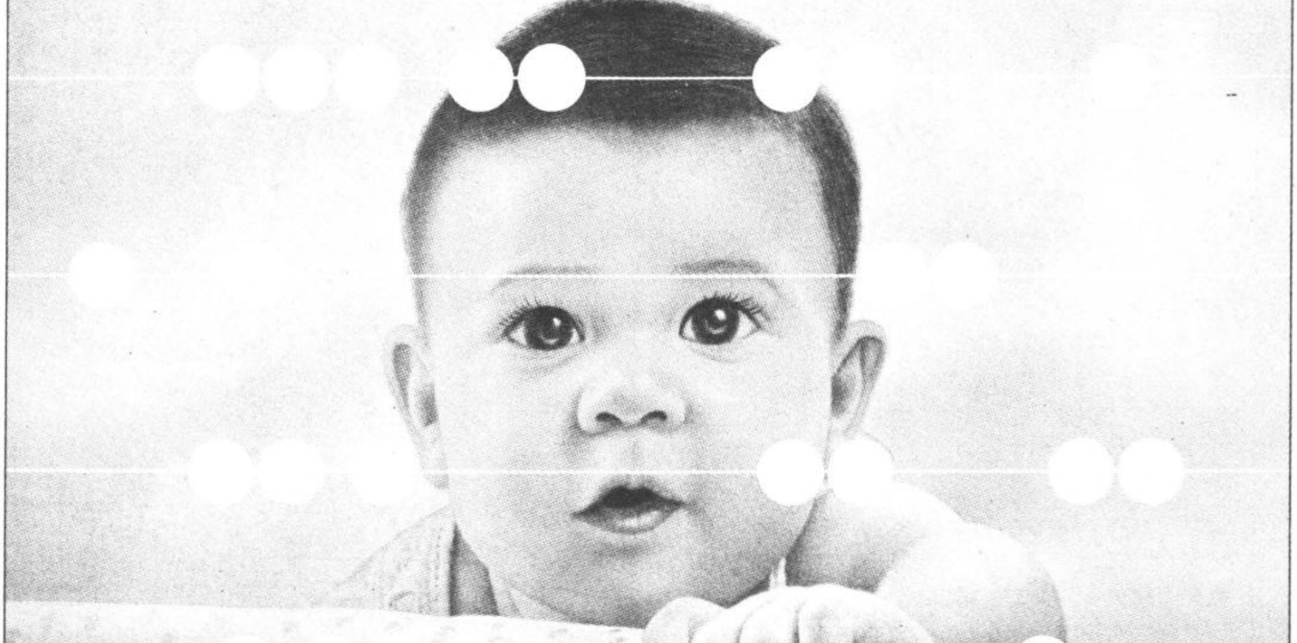

দুধযুক্ত ফ্যারেক্স শক্ত আহার

আপনার শিশুকে দেয়–সবদিক থেকে দ্রুত বেড়ে ওঠার জন্যে তার একান্ত প্রয়োজনীয় যাবতীয় পুষ্টি!

ডাক্তার এবং পুষ্টি-বিশারদদের মতে, শিশু প্রথম বছরে যে পুষ্টি পায় তার গুরুত্ব খুব বেশী।

তাই গ্ল্যাক্সো, আপনার শিশুর প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগাতে বিশেষভাবে তৈরী করেছে —দুধযুক্ত ফ্যারেক্স শক্ত আহার!

ফ্যারেক্স হ'ল প্রোটিন-সমৃদ্ধ যা শিশুর বাড়বৃদ্ধির জন্যে একান্ত প্রয়োজন। এতে যে বাড়তি আয়রণ আছে, তা শিশুকে বেশী সুস্থ রক্ত যোগায় এবং এর সঠিক অনুপাতের ক্যালসিয়াম আর ফসফরাস—শিশুর দাঁত ও হাড় মজবুত করার জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

চার মাস মত বয়েস থেকে আপনার শিশুকে দুধযুক্ত ফ্যারেক্স শক্ত আহার দিন।

এর মুখরোচক স্বাদ ওর দারুণ ভালো লাগবে—আর, এমন হেসে খেলে তরতর ক'রে বেড়ে উঠবে—দেখে আপনি গর্ব অনুভব করবেন!

সস্নেহ উপহার এনেছে গ্ল্যাক্সো!

দুধ মেশানোই থাকে

CLARION/B/GX/8/244BEN - R

আজই আমহার্স্ট স্ট্রিটে যাবে। তবে তার আগে তিনকড়িদাদুর কাছে যেতে হবে।

তিনকড়িদাদু পাড়ার সকলের দাদু। পার্শিবাগানটাকে ঠিক সাত্যকির পাড়া বলা যায় না। এ-পাড়ায় দীপক ছিল সাত্যকির স্কুলের বন্ধু। মেট্রোপলিটনে পড়ার সময় দীপকই তাকে একদিন তিনকড়িদাদুর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর বাড়িতে যাওয়ার কারণ হল কুকুর দেখা। তাঁর একগাদা কুকুর আছে। ডোবারমান্, অ্যালসেশিয়ান, এমন আরও কতরকম কুকুর।

আজও সাত্যকি দেখল দরজায় বড়-বড় করে লেখা: কুকুর হইতে সাবধান। ডোর-বেল টিপতেই ভিতর থেকে কুকুরের ডাক শোনা গেল। সাত্যকি এখন ডাক শুনেই বুঝতে পারে এ কোন্ কুকুর। এ ডাক ডালমাশিয়ানের।

তিনকড়িদাদুর বাড়ি থেকে সাত্যকি যখন বেরিয়ে এল, তখন তার মুখের চেহারা পালটে গেছে। চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ নেই। সাত্যকির মুখ আনন্দে ঝকঝক করছিল।

আমহার্স্ট স্ট্রিটে বেশ কয়েকটা শাঁখের দোকান। কেশব সেন স্ট্রিটের মুখে প্রথম দোকানটাতে নারান চিত্রকরকে পেয়ে গেল। আমহার্স্ট স্ট্রিট আর কেশব সেন স্ট্রিটের মুখেই দোকানটা। এখানেও দাদুর পাশে নগা। বুড়ো নারান এক ভদ্রমহিলাকে শাঁখা দেখাচ্ছিল। সাত্যকিকে দেখে চমকে উঠল, "আপনি?"

দোকানে ঢুকে বেঞ্চের উপর বসে সাত্যকি বলল, "হ্যাঁ, আপনার কাছেই এসেছি।"

ভদ্রমহিলার বোধহয় জিনিস পছন্দ হল না। উনি চলে গেলেন। এবার সাত্যকি নারানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার, নেপালবাবুর দোকান উঠে গেল নাকি?"

সাত্যকির কথায় বুড়ো অবাক, "সে কী! আপনি জানেন না?"

সাত্যকি মাথা নাড়ল।

বুড়ো বলল, "নেপালবাবু তো ব্যবসা উঠিয়ে দিলেন।"

সাত্যকি জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

নারান চিত্রকর অদ্ভুত হাসি হাসল। তারপর নগার দিকে ফিরে বলল, "যা, সিধুর দোকান থেকে আট আনার চা নিয়ে আয় তো।"

সাত্যকি বলল, "চা কি আমার জন্যে? আমি কিন্তু এখন চা খাব না।"

নগা পয়সা হাতে দাঁড়িয়ে রইল। ওর দাদু ধমকে উঠল, "কী রে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে? যা, শিগগির যা।"

নগা কেটলি আর পয়সা নিয়ে চা আনতে গেল।

এবার নারান চিত্রকর বলল, "একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনিও কি পুলিশের লোক?"

সাত্যকি মাথা নাড়ল।

"দেখুন বাবু, আমি গরিব মানুষ। মা-বাপ-মরা এই আমার একটাই নাতি। নেহাত কাজটা শিখেছিলুম, তাই রক্ষে।"

নগা চা নিয়ে ফিরে এল। নারান চিত্রকর সাত্যকিকে জিজ্ঞেস করল, "সিগারেট খাবেন?"

সাত্যকি বুঝতে পারল, নারান চিত্রকর নগাকে আড়াল করতে চাইছে। সাত্যকি ছেলেটার হাতে টাকা দিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট আনতে বলল।

দু' ভাঁড় চা নিয়ে এবার দু'জন মুখোমুখি।

নারান চিত্রকর চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, "অদ্ভুত ব্যাপার বাবু। আমার তো মাথায় কিছু ঢুকছে না।"

কথাবার্তা সেরে সাত্যকি রাস্তায় এসে দাঁড়াল। আজ তার মুখ আনন্দে টলটল করছে।

॥ আট ॥

দুপুরবেলায় সাত্যকিকে দেখে নাটু অবাক হয়ে গেল। "সতুদা আপনি?"

সাত্যকি হেসে বলল, "হ্যাঁ, আমি। আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে।"

নাটুর মন ভাল নেই। কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল। ফড়িং মল্লিকের ঘরের পাশেই নাটুর ঘর। নাটু অন্যমনস্ক হয়ে তার বাবুর কথা ভাবছিল। সাত্যকি আবার বলল, "আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে নাটু।"

সাত্যকির কথা শুনে নাটু রাজি হল। ফড়িং মল্লিকের দরজার তালা খুলে সাত্যকি ঘরে ঢুকল। জানলার ধারে পাথরের টেবিল। ড্রয়ারে চাবি লাগানো। নাটু একগোছা চাবি এনে দিল। চার-পাঁচটা চাবি নিয়ে চেষ্টা করতেই পাল্লা খুলে গেল। চার থাক ড্রয়ার। প্রথম ড্রয়ারে পাওয়া গেল একটা ফোটোর অ্যালবাম। ফোটোর অ্যালবামটা সাত্যকি নিজের কাঁধের ঝোলায় ভরল। পরের ড্রয়ারে একতাড়া পুরনো চিঠি ও একটা বাঁধানো খাতা। সেগুলিও সাত্যকি নিল। শেষের

ড্রয়ারে কয়েকটা পুরনো পয়সা, এক প্যাকেট তাস ও একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস। পয়সাগুলো নিয়ে সাত্যকি পর্যবেক্ষণ করল। কয়েকটা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাঘ-মুখো পয়সা। কয়েকটা পয়সায় কুইন ভিক্টোরিয়ার ছাপ। আর আছে একটা অকেজো পকেট-ঘড়ি। এখান থেকে কিছু নিল না। ড্রয়ার বন্ধ করে দিল। একটা সিগারেট ধরিয়ে ফড়িং মল্লিকের পালঙ্কের উপর বসল। নাটু বোকার মতন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। এসব ব্যাপারস্যাপার তার মাথায় কিছুই ঢুকছে না।

নাটু বলল, "এবার ড্রয়ারটায় চাবি দিয়ে দিই?"

সাত্যকি ঘাড় নেড়ে বলল, "হ্যাঁ।"

পালঙ্ক থেকে নেমে পাথরের টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে বসল। নিজের ঝোলা থেকে একটা সাদা কাগজ বার করল। সেই কাগজে খসখস করে কী সব যেন লিখল। এর পর হাতছানি দিয়ে নাটুকে ডাকল, "নাটু, তোমার বাবুর কয়েকটা জিনিস দরকারের জন্যে নিচ্ছি। যে-জিনিসগুলি নিলুম তার একটা ফর্দ করেছি, মিলিয়ে নাও।"

সাত্যকি পড়ল। নাটু মিলিয়ে নিল।

সাত্যকি এবার ঘর থেকে বেরোল, বলল, "নাটু, তালা লাগিয়ে দাও, আমি চললুম।"

নাটু সাত্যকির কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "আমার বাবুকে কি পাওয়া যাবে?"

সাত্যকি নাটুর পিঠে হাত দিয়ে বলল, "নিশ্চয়ই, সেই চেষ্টাই তো করছি।"

বিকেলে নিজের ঘর বন্ধ করে সাত্যকি জিনিসগুলো টেবিলে সাজিয়ে রাখল।

প্রথমে খুলল অ্যালবামটা। প্রথমের দিকে কয়েকটা পাতা ফাঁকা। তারপর এক ভদ্রলোকের ছবি। গোঁফওলা এক বৃদ্ধ। গায়ে বেনিয়ান। বুকটা দোভাঁজ-করা ফিতে দিয়ে বাঁধা। ছবির নীচে লেখা মেঘেন্দ্র মল্লিক। মানে মঘা মল্লিক। দ্বিতীয় ছবিটিতে মঘা মল্লিকের সঙ্গে একটি তরুণ। সাত্যকি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবিগুলি দেখছিল। বহুকালের পুরনো ছবি। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট নয়। সিপিয়া রঙের। তার মানে অনেকটা হাল্কা চকোলেট রঙের। তরুণটির গায়ে চিনে কোট। বুকটা লম্বা চেরা, তাতে গোল-গোল হাড়ের বোতাম কাপড় দিয়ে মোড়া। এই ছবির নীচে লেখা, পিতা ও পুত্র। তার মানে তারা মল্লিক।

সাত্যকি অ্যালবামের পাতা ওলটাতে লাগল। এবার একটা কুকুরের ছবি। কুকুরটি গ্রেটডেন। নীচে কুকুরের নাম লেখা, রঞ্জি। তিনকড়িদাদুর কথা মনে পড়ল। মঘা মল্লিকের একটি বাঘা কুকুর ছিল। তিনকড়ি মুখুজ্যের পিতামহ জগন্নাথ মুখুজ্যের দিনলিপি এই ঘটনায় নতুনভাবে আলোকপাত করেছে। সেদিন পার্শিবাগানে গিয়ে সাত্যকি অন্ধকারের ভিতরে আলো দেখতে পেয়েছে। জগন্নাথবাবুর দিনলিপিতে লেখা আছে, 'মঘা মল্লিকের একটি বাঘা কুকুর রহিয়াছে। গোপীকান্ত বলিয়াছে তাহার কর্তার সারমেয়-প্রীতি সে বরদাস্ত করিতে পারে না। কর্তা আবার শখ করিয়া কুকুরের বিলাতি নাম রাখিয়াছেন।'

সাত্যকি আবার বর্তমানে ফিরে এল। অ্যালবামের পাতা ওলটাতে লাগল। এবার একটা মোটরগাড়ির ছবি। সেকালের ফোর্ড গাড়ি। গাড়ির পা'দানিতে একটা বাচ্চা ছেলে বসে আছে। ছবির নীচে লেখা : বাবার গাড়ি ও আমি। এ আমি যে স্বয়ং ফড়িং মল্লিক, তা বোঝা যাচ্ছে। অ্যালবামে আর কোনও ছবি নেই। সাত্যকি অ্যালবাম বন্ধ করে চিঠির তাড়া নিয়ে বসল।

প্রথমে সঙ্কোচ হল। কারও ব্যক্তিগত চিঠি পড়া কি ঠিক? কিন্তু মুহূর্তে সাত্যকি সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠল। সত্যানুসন্ধানের জন্যে এখন তাকে অনেক কিছু করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ল। তিনি বলেছিলেন, সত্যের বিনিময়ে আমি সব কিছু বর্জন করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কোনও কিছুর বিনিময়ে আমি সত্যকে বর্জন করতে রাজি নই। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সাত্যকিকে উদ্বুদ্ধ করে।

চিঠির তাড়া খুলল। বেশির ভাগ ব্যবসা-সংক্রান্ত চিঠি। চিঠিগুলি ঘাঁটতে-ঘাঁটতে একটা অদ্ভুত চিঠি চোখে পড়ল। একটা লালরঙের খাম। খামের ভিতর থেকে একটা চিঠি বেরোল। দেশি তুলোট কাগজে লাল কালি দিয়ে লেখা, 'মনে আছে তো?' শুধু এই একটি প্রশ্নবোধক বাক্য। জনৈক 'ন' চিঠিটি লিখছেন জনৈক 'ফ'কে। সাত্যকি খামের উপরটা দেখল। চিঠি এসেছে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন মল্লিকের নামে। কে এই শ্যামাপ্রসন্ন? নামটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। সাত্যকি চোখ বুজে ভাবতে বসল। তিরিশ সেকেণ্ড বাদেই মনে পড়ে গেল। পাড়ার দুর্গাপুজোর কথা। এই তো, বছর দুয়েক আগের ব্যাপার। সেবারে সাত্যকি সেক্রেটারি। পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ফড়িং মল্লিককে রাখা হয়েছিল। উনি অবশ্য কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত নামটুকু দিয়েই ক্ষান্ত হলেন। ফড়িং মল্লিকের ভাল নাম শ্যামাপ্রসন্ন মল্লিক। খামের উপর ডাকঘরের মোহরের ছাপ অস্পষ্ট। বোঝা যাচ্ছে না চিঠিটি কোথা থেকে লেখা হয়েছে। তবে চিঠিটির গায়ে ডাকঘরের নাম বোঝা না গেলেও তারিখটা বোঝা যাচ্ছে। একেবারে হালের চিঠি। সাত্যকি খামের ভিতর আর-একটুকরো কাগজ পেল। সাদা এক খণ্ড কাগজে একটি বৃত্ত আঁকা। বৃত্তের ভিতরে লেখা 'উদ্যান'। এবং বৃত্তের এক পাশে একটি ছোট বর্গক্ষেত্র। বর্গক্ষেত্রের ভিতরে লেখা, 'মোটর'। একটি বাক্য এবং অদ্ভুত জ্যামিতিক চিত্রটি নিয়ে সাত্যকি স্থির হয়ে বসে রইল।

কয়েক সেকেণ্ড বাদে আর্কিমিদিসের মতন লাফিয়ে উঠে বলল, "ইউরেকা, ইউরেকা।"

দরজায় কে ধাক্কা দিচ্ছে। সাত্যকি দরজা খুলে দেখল, চায়ের কাপ হাতে শ্রীমান মধুসূদন। মানে মধু। মধুকে দেখে আবার আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, "পাইয়াছি রে, পাইয়াছি।" মধু তো থ। চায়ের কাপ টেবিলে রেখে মধু বলল, "আবার ভূতে ধরেছে তো?"

সাত্যকি হেসে ফ্যালে, "কী বললি, ভূত? হ্যাঁ, ভূত। তুই ঠিক বলেছিস মধু, ভূত। ওয়াটার্লুর ভূত।"

চা খেতে-খেতে পরমানন্দে একটা সিগারেট ধরাল। এবার খাতাখানা টেনে নিল। খুব পুরনো খাতা। তবে বোঝা যায়, পরে খাতাটি যত্ন করে বাঁধাই করা হয়েছে। খাতায় বিচ্ছিন্নভাবে কিছু লেখা আছে। একটা লেখা খুব চেনা মনে হল। হাতের লেখাটা নয়, ভাষাটা। সাত্যকি টেবিল থেকে

নিজের নোটবুকখানা টেনে নিল। সেদিন কলেজ স্ট্রিটে মজুমদারমশাইয়ের পুরনো বইয়ের দোকানে বসে কিছু নোট নিয়েছিল। কলকাতা সম্পর্কে একটি পুরনো বই থেকে সে যা নোট নিয়েছিল মল্লিকবাড়ির খাতায়, তার কিছুটা অংশ টোকা আছে, 'খ্রিঃ ১৭৩৭ অব্দের ১১ই অক্টোবর তারিখে ভাগীরথীতে ভয়ঙ্কর ঝড় হয়, সঙ্গে-সঙ্গে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পও হয়। এই ভূমিকম্পেই প্রাচীন সেন্ট জন'স্ চার্চের চূড়া ভাঙিয়া যায়।' নীচে ছোট একটি মন্তব্য লেখা : 'এই ঘটনা শাপে বর হইয়াছে।'

তারপর ফাঁকা পাতা। একের পর এক ফাঁকা পাতা। আবার লেখা, 'সরকারমশাই লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। সংসার ভাসিয়াছে। বাবাজি বলিতেন, যে-শত্রু পথের কন্টক তাহাকে হত্যা করায় পাপ নাই। বাবাজি সরকারকে সরাইয়াছিলেন। এবার অনুলিপি নক্ষত্রবাবু পাইয়াছেন। তাঁহার ভাগ্য ফিরিয়াছে। তিনিও বাবাজির পথ অনুসরণ করিলেন।' আবার কিছু ফাঁকা পাতা। এবার অন্যরকম হাতের লেখা। সহজ ভাষায় লেখা, 'অনুলিপি কোথায় ?' আবার ফাঁকা পাতা। এবার খাতার শেষ দিকে লেখা, 'ওয়াটার্লুতে নেপোলিয়ান এসেছেন। লিপি তাঁর কাছে। পত্র দিয়েছিলেন। উত্তর দিয়েছি। পত্রপাঠ তা নষ্ট করেছি। দেখা হবে। মহাত্মা অক্ল্যাণ্ডের ভগিনীগণের স্থাপিত উদ্যানে দেখা হবে।'

রহস্যটা ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে আসছে। সাত্যকি ভাবতে বসল। 'ন' লিখেছিল 'ফ'কে। নেপাল মুতসদ্দি চিঠি লিখেছিল ফড়িং মল্লিককে। মনে আছে তো ? অর্থাৎ দেখা হওয়ার কথা মনে আছে কি না। বাবাজি কে হতে পারেন ? সন্ন্যাসী বেশধারী টোপা মিত্তিরই হবেন। কিসের লোভে বগলাচরণ উধাও হলেন ? গুপ্তধন হওয়াই স্বাভাবিক। টোপা মিত্তির পথের কন্টক বগলাচরণকে হত্যা করে মঘা মল্লিকের কাছে এসেছিলেন। সম্ভবত বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মঘা মল্লিকের সহযোগিতা নিয়ে অতুল ঐশ্বর্য ভোগ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এ-লেখা সম্ভবত মঘা মল্লিকের। কলমের আঁচড় দেখে মনে হয় লেখা হয়েছে খাগের কলমে। মঘা মল্লিক বাবাজির পথ অনুসরণ করলেন। মানে বাবাজি অর্থাৎ টোপা মিত্তিরকে হত্যা করেছেন ! মঘা একটি নক্ষত্র। নক্ষত্রবাবু অনুলিপি পেয়েছেন। এর অর্থ হল মঘা মল্লিক গুপ্তধনের সংকেত পেয়েছেন। এর ফলে মল্লিক-পরিবারের ভাগ্যোদয় হয়। এর পরে ফাঁকা পাতা। 'অনুলিপি কোথায় ?'—এই বাক্যটি অনেককাল পরে লেখা। বোঝা যাচ্ছে ফাউন্টেন পেনে লেখা হয়েছে। সম্ভবত ফড়িং মল্লিকের লেখা। মল্লিক-পরিবার গুপ্তধনের সংকেতটি হারিয়েছে। এর পরে নেপাল মুতসদ্দির ওয়াটার্লুতে আসার কথা আছে। লিপি যে নেপালের কাছে আছে, তা অংশুর কাছ থেকে জানা গেছে। সংকেতটি যথার্থই বগলাচরণের লেখা কি না তা যাচাই করার জন্য এক রবিবার সকালে নেপাল অংশুর কাছে এসেছিলেন। নেপাল ফড়িং মল্লিককে চিঠি দিয়েছিলেন। পত্রপাঠ সে-চিঠি যেন নষ্ট করে দেওয়া হয় এমন নির্দেশও দিয়েছিলেন। মহাত্মা অক্ল্যাণ্ডের ভগিনীগণের স্থাপিত উদ্যান মানে ইডেন গার্ডেনে ফড়িং মল্লিকের সঙ্গে নেপালের দেখা করার কথা। জ্যামিতিক চিত্রে নেপাল মুতসদ্দি এঁকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন ইডেন

গার্ডেনের কোন্ জায়গায় ফড়িং মল্লিক গাড়ি নিয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করবেন। যে-কোনও কারণেই হোক, এ-চিঠি ফড়িং মল্লিক নষ্ট করেননি।

॥ নয় ॥

নারান চিত্রকর স্বীকার করেছে নেপালবাবুর ব্যবসাটা রহস্যজনক। অর্ডারের নামে পেটি-পেটি শাঁখ ও ঝিনুকের গয়না বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হত। বুড়ো কারিগর অকপটে বলেছে, দোকানে অত গয়না তৈরি হত না।

মধ্যরাত্রে ওয়াটার্লু স্ট্রিটের সেই এক চেহারা। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের গাড়ি-বারান্দার নীচে সেই দুটি অন্ধ ভিখিরি। লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে তারা উত্তর দিকে হাঁটতে শুরু করল। হাঁটতে-হাঁটতে ওরা ওয়াটার্লু স্ট্রিটে ঢুকল। ঢুকে ওরা কিছুক্ষণ দাঁড়াল। পরস্পরের মধ্যে নিচু গলায় কী সব কথা বলল। তারপর আবার হাঁটতে লাগল। রাস্তা খাঁখাঁ। কোথাও কোনও শব্দ নেই। সেই বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল। দুজনেই চোখ থেকে কালো চশমা খুলে পকেটে পুরল। সাদা লাঠি দুটো ফুটপাথের উপর শুইয়ে রাখল। একজন পকেট থেকে দূরবিন বার করল। দূরবিন দিয়ে বাড়িটাকে দেখতে-দেখতে চাপা গলায় বলল, "অংশু, মনে হচ্ছে বাড়ির ভেতরে আলো জ্বলছে।"

অংশু বলল, "তা হলে আমরা এখন কী করব ?"

সাত্যকি চোখ থেকে দূরবিন নামাল। এবার বলল, "যে-কোনও উপায়ে বাড়িটার ভেতর ঢুকতে হবে।"

অংশু জিজ্ঞেস করল, "সূর্যবাবু কখন আসবেন ?"

সাত্যকি উত্তর দিতে যাচ্ছিল। এমন সময় নিস্তব্ধ রাস্তায় খট্‌খট্ আওয়াজ শোনা গেল। চকিতে দু' বন্ধু লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে অন্ধকার দেওয়ালে গা ঢাকা দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। শব্দটা কোথা থেকে আসছে ? ওরা দেখল ডালহৌসির

দিক থেকে একটা লোক এইদিকে এগিয়ে আসছে। লোকটার দু' বগলে ক্রাচ। লোকটা ক্রমশ এগিয়ে আসছিল। এবার কাছাকাছি আসতেই তার মুখের উপর স্ট্রিট-লাইটের আলো এসে পড়ল। চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে অংশু বলল, "লোকটাকে যেন কোথায় দেখেছি।"

সাত্যকি ধীর গলায় বলল, "লোকটার টাক-মাথায় উইগ পরালে আর বাঁধানো দাঁত খুলে নিলে ও নেপাল মুতসদ্দি হয়ে যাবে।"

অংশু উত্তেজনায় ঠকঠক করে কাঁপছিল। সাত্যকির হাত ধরে বলল, "হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।"

আচম্‌কা ওই বাড়িটার উপরের জানলা খুলে গেল। জানলায় একটা বুড়োর মুখ দেখা গেল।

বিস্ময়ে সাত্যকি বলে উঠল, "আরে। এ যে ফড়িং মল্লিক।"

সাত্যকির কথা শেষ হতে না হতেই বোমা ফাটার শব্দ শোনা গেল। নেপাল মুতসদ্দি আর্তনাদ করে ওয়াটার্লু স্ট্রিটের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন।

অংশু বলল, "কী হল? কে বোমা ছুঁড়ল?"

সাত্যকি বলল, "বোমা নয়, বন্দুক। ফড়িং মল্লিক বন্দুক ছুঁড়েছেন।"

সাত্যকি পকেট থেকে বাঁশি বার করে ফুঁ দিল।

॥ দশ ॥

সাত্যকি বলল, "সব ব্যাপারটা তো তুমি জানো। এবার গুছিয়ে বলো তো।"

অংশু শুধু যে ভাল গল্প বলতে পারে তা নয়, গল্প বলতে ভালও বাসে। সাত্যকির ঘরে আজ ওরা তিনজন। সূর্য আর সাত্যকি খাটের উপর। অংশু ইজিচেয়ারে।

অংশু শুরু করল, "১৭৩৭ সালের ১১ অক্টোবর যে ঐতিহাসিক ঝড় ও ভূমিকম্প হয়, তাতে কলকাতার ভয়াবহ ক্ষতি হয়। মঘা মল্লিক টোপা মিত্তিরের কাছে শুনেছিলেন এটা নাকি শাপে বর হয়েছে। তাই খাতায় ঐতিহাসিক ঘটনাটি উল্লেখ করে ওই মন্তব্য করেছিলেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে শাপে বরটা কী?

"ঐতিহাসিক তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি, সে সময় নাকি গঙ্গায় বহু নৌকো জাহাজ ডিঙি ধ্বংস হয়। মোট দু' হাজার জলযান। তার মধ্যে ইংরেজদের আটখানা জাহাজ ছিল। সেইসব জাহাজে প্রচুর সোনাদানা ধনরত্ন ছিল।

"ফড়িংবাবু তাঁর বাবার কাছে এ-সব সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলেন। তারা মল্লিক মঘা মল্লিকের কাছ থেকে যা শুনেছেন সেটা অসত্য নয়। কেননা, সে-সব কথা মঘা মল্লিককে টোপা মিত্তির বলেছিলেন। টোপা মিত্তির ছিলেন স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্র। সে সময় ওই কলেজের নাম ছিল জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ। টোপা মিত্তির পড়ুয়া মানুষ ছিলেন। অনেক খোঁজখবর রাখতেন। গঙ্গাগর্ভে হারিয়ে যাওয়া ধনরত্নের সন্ধান টোপা মিত্তির পেয়েছিলেন ভারতবর্ষের কোনও একটি জায়গায়। জায়গাটা যে ঠিক কোথায়, তা আমরা জানতে পারলুম না। তা জানতেন বগলাচরণ, টোপা মিত্তির, আর মঘা মল্লিক। এঁরা কেউ এখন নেই। জায়গাটির একটা সাংকেতিক ছক টোপা মিত্তির বগলাচরণকে দিয়ে তৈরি করান। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ছকটি তিনি নিজে না করে বন্ধুকে দিয়ে তৈরি করালেন কেন? আমি আমার প্রপিতামহ বগলাচরণের হাতের লেখা দেখেছি। একেবারে ছাপার মতো হাতের লেখা। হয়তো এই কারণে টোপা মিত্তির বন্ধুকে দিয়ে ছকটি লেখান। যা হোক, তিনি বগলাচরণকে হত্যা করেন। মঘা মল্লিকের বিষয়বুদ্ধি ছিল। টোপা মিত্তির সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে বহুকাল বাদে উত্তর কলকাতায় ফিরে আসেন। অতুল সম্পদ কীভাবে ভোগ করবেন, এই চিন্তা তখন তাঁর মাথায়। মঘা মল্লিককে দেখে হাতে স্বর্গ পেলেন। এই তো যোগ্য লোক। এঁর সহযোগিতা তাঁর চাই। মঘা মল্লিক অত্যন্ত ঘুঘু ছিলেন। টোপা মিত্তিরকে 'বাবাজি, বাবাজি' বলে খুব খাতির-যত্ন করে ছক হাতিয়ে নিয়ে তাঁকে খুন করলেন। খুব গোপনে। যাকে বলে গুমখুন। কিন্তু মঘা মল্লিকের মৃত্যুর পর থেকে মল্লিকদের অবস্থা পড়তে থাকে।"

সূর্য হাত তুলে অংশুকে থামাল। জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু সেই সাংকেতিক ছকটা তবে গেল কোথায়? আর এই নেপাল মুতসদ্দিই বা কে?"

অংশু হাসল, "ব্যস্ত হবেন না সূর্যবাবু। বলছি, সব বলছি। সব বাহবা কিন্তু সাত্যকির প্রাপ্য। তার অদ্ভুত বুদ্ধি, তৎপরতা আর অনুসন্ধান একে-একে এই জটিল রহস্যকে উন্মোচিত করেছে। পার্শিবাগানের তিনকড়ি মুখুজ্যের কাছ থেকে একটি অভিনব তথ্য জোগাড় করেছে। এবার, সাত্যকি, তুমি বলো।"

সাত্যকি কথা শুরু করল, "মল্লিকবাড়ির অতীত অংশুর কাছ থেকে যা পেয়েছিলুম, তাতে সমস্ত ব্যাপারটায় একটা হিসেবের গণ্ডগোল থেকে যাচ্ছিল। কে এই নেপাল মুতসদ্দি? যে-ছক মঘা মল্লিকের কাছে ছিল, তা তাদের ফ্যামিলি থেকে ছিটকে ওই লোকটার হাতে গেল কী করে। ছকটা প্রকৃত বগলাচরণের হাতের লেখায় কি না তা যাচাই করতে লোকটা অংশুর কাছে এসেছিল। ছদ্মবেশে। অনেকের কম বয়সে দাঁতের অসুখে দাঁত পড়তে থাকে। নেপালের ব্যাপারটাও তাই। মাথায় উইগ্ পরেছিল, আর ইচ্ছে করেই সেদিন বাঁধানো দাঁত পরেনি। কিন্তু খোঁড়া মানুষ তো ছদ্মবেশে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারে না। সুতরাং ট্যাক্সি থেকে নামার উপায় ছিল না। বাতের ব্যথার ধুয়ো তুলতে হয়েছে।

"যাক্, যা বলছিলুম। রহস্যের ভিতরে যে শূন্যতাটা ছিল তা ঘুচে গেল তিনকড়িদাদুর কাছে গিয়ে। তাঁর পিতামহ জগন্নাথ মুখুজ্যের দিনলিপিতে গোপীকান্ত মুতসদ্দির কথা পাওয়া যায়। এখন তোমরা বলতে পারো, হঠাৎ তিনকড়িদাদুর কাছে কেন গেলুম। তোমরা জানো, সিংহবাহিনী-রহস্যভেদের ব্যাপারে আমি এইরকম একজন প্রবীণ মানুষের কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য পেয়েছি। নব্বুই, না না, ভুল বললুম, তখন তাঁর বিরানব্বুই চলছিল, হ্যাঁ বিরানব্বুই বছর বয়সের এক মহিলা। রাঙাদিদি। বাবার জ্যাঠাইমা। আসলে বয়স্ক মানুষদের প্রতি আমার একটা আলাদা ঝোঁক আছে। তার ওপর সেই বয়সের সঙ্গে যদি বনেদিয়ানার যোগ থাকে, তা হলে তো সোনায় সোহাগা। তিনকড়িদাদুর কথা মনে পড়ে গেল। তিনকড়িদাদু পার্শিবাগানের বহুকালের

বাসিন্দা। কথায়-কথায় মল্লিক-পরিবারের প্রসঙ্গ উঠল। উঠলও অদ্ভুত ভাবে। কুকুরের প্রসঙ্গ থেকে। আমি বলেছিলুম, 'আচ্ছা দাদু, এ-পাড়ায় আপনি বোধহয় প্রথম কুকুর পোষেন।' তিনকড়িদাদু হেসে বললেন, 'তা একরকম বলতে পারো। তবে কুকুর পোষার বাতিক বহুকাল আগে তোমাদের পাড়ার মল্লিক-ফ্যামিলিতে দেখা গিয়েছিল।' এই বলে তিনি তাঁর পিতামহ জগন্নাথের দিনলিপিটি আমাকে দেখতে দিলেন। মল্লিকবাড়ির সরকার গোপীকান্ত মুতসদ্দি মঘা মল্লিকের আমলের। গোপীকান্ত প্রায়ই জগন্নাথের সঙ্গে পাশা খেলতে আসতেন। গোপীকান্ত সম্ভবত ছকের কথা জানতেন। ছকের কথা তারা মল্লিক জানলেও তিনি তা তাঁর বাবার কাছ থেকে পাননি। মৃত্যুকালে গুপ্তধনের হদিস মঘা মল্লিক পুত্রকে বলে যাননি। মঘা মল্লিকের মৃত্যুর পরেই গোপীকান্ত কাজে অবসর নিয়ে নিজের গ্রাম দাঁতনে চলে যান।"

সাত্যকি থামল। মধু চা দিয়ে গেল। চায়ে চুমুক দিয়ে সাত্যকি আবার বলতে শুরু করল, "গোপীকান্তের প্রপৌত্র শ্রীমান নেপাল। গোপীকান্ত ছক হস্তগত করেছিলেন, কিন্তু এর মর্মোদ্ধার করতে পারেননি। ছকটি টোপা মিত্তিরের রচিত। অনুলিপিকার বগলাচরণ। আমার মনে হয় অজ্ঞাতবাসকালে টোপা মিত্তির ধন সঞ্চয় করেছেন, ব্যয় করেননি। বগলাচরণকে সরিয়ে পথ নিষ্কণ্টক করে মঘা মল্লিকের কাছে এসেছিলেন। ভারতবর্ষের কোথাও-না-কোথাও সে-ধন লুকনো ছিল, হয়তো এখনও আছে। মঘা টোপাকে সন্নান এবং ছকের নির্দেশমতো সম্পদ একটু-একটু করে খরচ করতে থাকেন। জাহাজডুবি থেকে যদি অঢেল সোনাদানা কোনও পর্বতের গুহায় বা নদীগর্ভের কোনও গোপন জায়গায় জমা হয়ে থাকে আর সে-সম্পদ যদি মঘা মল্লিকের আয়ত্তে আসে তা হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়? মঘা মল্লিকের সোনার কারবার ছিল। কারবারে সোনাদানা বাড়লে চট করে সেটা কারও মনে সন্দেহ জাগাবে না। মঘা মল্লিকের মৃত্যু এবং ছক নিয়ে গোপীকান্তের সরে পড়ার জন্যেই এর পর থেকে মল্লিক পরিবারের অবস্থা পড়তে থাকে।

"শ্রীমান নেপালচন্দ্র গোপীকান্তের ধারাই পেয়েছে। এত বড় স্মাগলার খুব কমই দেখা যায়। সূর্য তদন্তের কাজে নেপালের পূর্ব-ভূমিকাটি আবিষ্কার করেছে। সুদূর গোয়ায় তার ঘাঁটি। কলকাতায় আসার কারণ ছকের মর্মোদ্ধার করা। তার ধারণা ছিল ফড়িং মল্লিক এর মর্মোদ্ধার করতে পারবেন। কলকাতায় আসবার আগে সে ফড়িং মল্লিককে চিঠিপত্র দেয় এবং কিছুদিন কলকাতায় থাকবার জন্যে একটি অভিনব ব্যবস্থা নেয়। কলকাতায় তার কিছু শাগরেদ ছিল। সে এবার কিছুদিন কলকাতায় স্মাগলিং-এর ব্যবসা শুরু করল। এমন একটা জায়গায় একটি বাড়ি মোটা টাকায় লিজ নিল, যেখানে সচরাচর কারও সন্দেহ-দৃষ্টি পড়বে না। লোক-দেখানো শাঁখ ও গয়নার দোকান সাজাল। নারান চিত্রকরের মতন কারিগর জোগাড় করল। আর ঝিনুক ও শাঁখের গয়নার নামে চোরাই সোনা পাচারের কাজ শুরু করে দিল।

"নেপাল কলকাতায় কোথায় এসেছে, এ-খবরটা শাগরেদদের ও ফড়িং মল্লিককে একটি অভিনব উপায়ে জানাল। সে কাগজে বিজ্ঞাপন দিল : ওয়াটার্লুর রণক্ষেত্রে নেপোলিয়ান এসেছেন। ফড়িং মল্লিককে ইডেন গার্ডেনে গাড়ি নিয়ে আসতে বলেছিল। তারপর ফড়িং মল্লিককে ওয়াটার্লু স্ট্রিটে নিয়ে যায়। যখন সে জানতে পারল, ফড়িং মল্লিকও এ-সংকেতের মানে জানে না, তখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। দোকান তুলে দিয়েছিল, কেননা, পুলিশ এবার ফড়িং মল্লিকের খোঁজে নামবে। ফড়িং মল্লিককে অনাহারে তিলে তিলে মারতে চাইল। সেদিনটার কথা ভাবো। শাগরেদদের জিম্মায় বুড়োকে রেখে নেপাল বেরিয়েছিল। শাগরেদরাও ভাবতে পারেনি, বুড়োমানুষটি এমন কাজ করতে পারেন। দেওয়ালে বন্দুক ঝোলানো ছিল। ফড়িং মল্লিক যৌবনে বন্দুক নিয়ে শিকার করেছেন। শাগরেদরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। তিনি বন্দুক নিয়ে তৈরি ছিলেন। জানলায় চোখ রেখে অপেক্ষা করছিলেন নেপাল কখন ফেরে। অবশ্য সেদিন আমরাও অন্ধের ছদ্মবেশে ওই রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। আমার দিকে তাঁর চোখ পড়েছিল, কিন্তু রাস্তার অন্ধ ভিখিরি বলে ভ্রূক্ষেপ করেননি।"

সাত্যকি থামল। সবাই চুপ।

অংশু কথা বলল, "সূর্যবাবু, এবার আপনি কিছু বলুন।"

সূর্য নড়েচড়ে বসল। তারপর বলল, "আমার আর নতুন করে কিছু বলবার নেই। সবই বলা হয়ে গেছে। নেপালদের কলকাতার দলটাকে ধরা হয়েছে। তবে গোয়ায় ওদের বিরাট ঘাঁটি। গোয়ার পুলিশকে সব জানানো হয়েছে। ওয়াটগঞ্জের একটা গ্যারাজ থেকে ফড়িং মল্লিকের অস্টিনটা উদ্ধার করা হয়েছে। নেপালকে খুন করে ফড়িং মল্লিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলেছিলেন।"

অংশু বলল, "তা তো জানি। কিন্তু এখন কেমন আছেন?"

সূর্য সাত্যকির দিকে তাকাল। সাত্যকি মাথা নাড়ল। মনে হল সে যেন সূর্যকে কিছু বলতে বলছে।

সূর্য বলল, "আজ ভোরে পুলিশ-হাসপাতালে ফড়িং মল্লিক মারা গেছেন।"

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ছবি এঁকেছে **অরিন্দম ভাদুড়ী** (বয়স ৯)

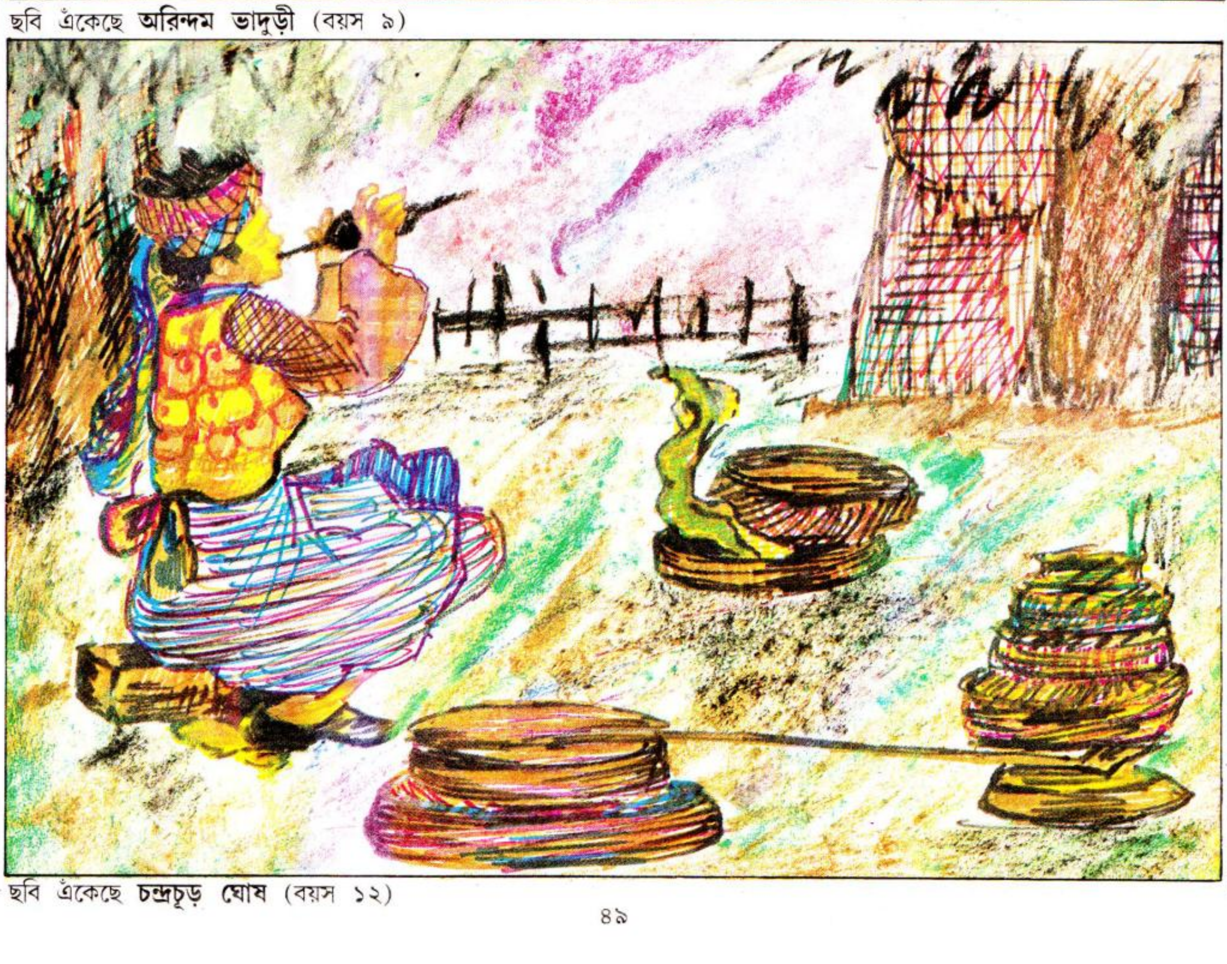

ছবি এঁকেছে **চন্দ্রচূড় ঘোষ** (বয়স ১২)

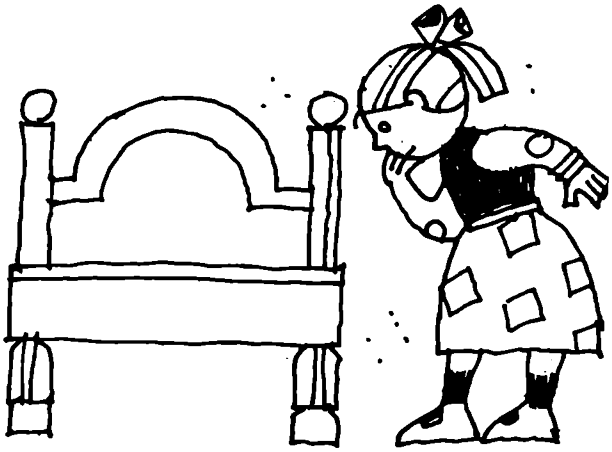

খাটের তলায়

সন্ধেবেলা। আমি ও আমার দিদি বসে পড়াশুনো করছি। হঠাৎ শুনি পাড়ার একজন কাকু বলতে বলতে যাচ্ছেন, "এই তো এখন···দিলীপবাবুর খাটের তলায় মস্ত বড়···।"

দিদি বলল, "কী হয়েছে রে?"

আমি বললাম, "জানি না।"

আমরা আবার পড়ায় মন দিলাম। কিন্তু আমার কৌতূহল থেকেই গেল। কী হল? কোথায় হল? ভাবলাম, কথাগুলো বাবাকে জানালে কেমন হয়? আমি দৌড়ে পাশের ঘরে গেলাম। সেখানে বাবা খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বাবাকে কথাটা বললাম। বাবা তেমন আমল দিলেন না।

আমি তখন বললাম, "বাবা কী হয়েছে দেখে আসি চলো।" বাবা বললেন, "চলো।"

আমরা বার হলাম। একটু দূরে গোলমাল। ওখানে গিয়ে শুনি মস্ত বড় একটা গোখরো সাপ দিলীপকাকুর খাটের তলায় ঢুকেছিল।

সন্ধেবেলা দিলীপকাকু বসে টি ভি দেখছিলেন। তাঁর মেয়ে মামুনদিদি নিজের হাতে মাংস রান্না করে বাবাকে খেতে দিচ্ছিল। হঠাৎ দেখে খাটের তলা থেকে কী যেন একটা মুখ বাড়াচ্ছে। মনে হল সাপ। বড় ধরনের সাপ।

মামুনদিদি চিৎকার করে উঠল "সাপ, সাপ" বলে। চিৎকার শুনে পাড়ার ছেলেরা ছুটে এল। তারপর তারা সাপটাকে বার করে এনে মেরে ফেলল।

আমি বাবার হাত ধরে মরা সাপটা দেখতে গেলাম। মার খেয়ে সাপটার মুখ থেঁতলে গেছে, কিন্তু সেটার লেজ তখনও নড়ছিল।

নয়নিকা বিশ্বাস (বয়স ৯)

হঠাৎ সেদিন

আমার একটা কুকুর ছিল
রঙ ছিল তার কালো
তার ভয়েতে ঢুকত না চোর
লোকে বলত ভাল
হঠাৎ সেদিন ভোররাতেতে
চেঁচিয়েছিল জিম
সেই ডাকেতেই পড়ল ধরা
ডাকাত-সর্দার ভীম

লিপিকা সিংহ (বয়স ৮)

দেখব আমি ঘুরে

দেখব আমি ঘুরে ও ভাই
দেখব আমি ঘুরে
কোথায় কী যে হয়ে যাচ্ছে
বিশ্বজগৎ জুড়ে।
আজই যেতাম হিল্লি-দিল্লি
কালকে যে নরওয়ে
মোটেই আমি পালাতাম না
দুষ্টু লোকের ভয়ে
পরিব্রাজক হতাম যদি
করত না কেউ বারণ
হিউ য়েন-সাঙ বা কলম্বাসের
মতোই অসাধারণ।
তবে যদি খুব বৃষ্টি
নামত আকাশে
ভয়ে আমার মুখখানি যে
হতই ফ্যাকাসে
একছুট্টে হিল্লি থেকে
আর একছুট্টে দিল্লি
মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে
হতাম যে তাঁর বিল্লি।

মউলি মিশ্র (বয়স ১০)

শয়তানের চোখ

সমরেশ মজুমদার

আগে যা ঘটেছে : সুপ্রকাশ চা-বাগানের কর্তা। তাঁর স্ত্রী কুমুদিনী পঙ্গু। ছেলে সায়ন স্কুলের ছুটিতে বাগানে এসেছিল। বেওয়ারিশ ঘোড়া তাকে নিয়ে ভুটানের জঙ্গলে ঢোকে। সেখানে সুধাময় সেন তাকে বিছের কামড় থেকে বাঁচান। তিনি নাকি নেতাজির ফৌজে ছিলেন, ইংরেজদের হাতে বন্দী হন, পালিয়ে জঙ্গলে আছেন, বাইরের জগতের খবর রাখেন না। সায়নকে তিনি যে জংলি মানুষদের ডেরায় নিয়ে যান, তাদের পোশাকে সেই অগ্নি-চিহ্ন, যা দেখে বুধুয়া-বুড়ো ভয় পেয়েছিল অন্যদের চোখ এড়িয়ে গুহায় ঢুকে সায়ন আক্রান্ত হয়। উদ্ধার পেয়ে দ্যাখে, দু'জন বন্দী লোকের একজনকে মেরে ফেলা হল। গুপ্ত মালের হদিস দেবার জন্যে অন্যজনকে এক অশ্বারোহী নদীর ধারে নিয়ে যায়। সেখানে দু'জনেই মারা পড়ে। সায়ন বোঝে, এরা চোরাকারবারি, এবং সুধাময়ই এদের নেতা। মৃত অশ্বারোহীর ঘোড়ায় উঠে সে পালায়। ভাগ্যক্রমে সে সর্পাঘাত থেকে বেঁচেছে। তার ঘোড়াটা কিন্তু বাঁচল না। পাহাড়ে যারা সাংকেতিক আগুন জ্বালে, তাদেরও দেখেছে সায়ন। এখন সে উঠছে পাহাড়ের চুড়োয় সুধাময় সেনের ডেরায়। তারপর···

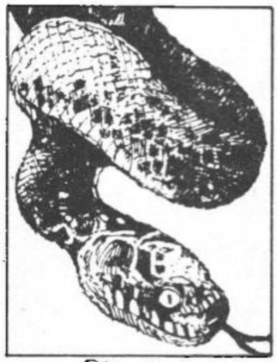

পায়ে পায়ে দড়িটা ধরে ওপরে উঠে এল সায়ন। সবসময় তার নজর ওপরের দিকে ছিল। সেখানে হনুমানটাই বসে আছে গম্ভীর মুখে। দ্বিতীয় কোনও প্রাণীকে সঙ্গী না করে সে সায়নকে দেখে যাচ্ছে। সুধাময় সেন আছেন কি না টের পাওয়া যাচ্ছে না।

ওপরে ওঠামাত্র হনুমানটা দক্ষ হাতে দড়িটা টেনে তুলতে লাগল ওপরে। সায়ন আশ্বস্ত হল এই কারণে, মানুষের মতো পশুদের মনে শত্রুতা সংক্রামিত হয় না সহজে। তার প্রভু কী করেছে হনুমানটার জানার প্রয়োজন নেই। সে পুরনো অভ্যেসমতো কাজ করে যাচ্ছে। সায়ন চটপট গুহার সামনে চলে এল। সুধাময় সেন সত্যিই নেই। শোঁ-শোঁ শব্দে হাওয়া বইছে। গুহার ভেতর উঁকি মারতেই সন্দেহ হল। সায়ন গুটিগুটি ভেতরে ঢুকতেই বুঝতে পারল। সুধাময় সেনের কোনও জিনিসপত্র এখানে নেই। সেই ঝোলানো ব্যাগ কিংবা টুকিটাকি উধাও। অর্থাৎ সুধাময় সেন এই আস্তানায় আর নেই।

যে মানুষটাকে এতক্ষণ সে শত্রু ভাবছিল, তার অনুপস্থিতি চকিতে সায়নকে অসহায় করে তুলল। এই পাহাড়, ঘন জঙ্গলে সে এখন সত্যিকারের একা। ফিরে যাওয়ার যেটুকু সুযোগ ছিল সেটুকু যেন চোখের সামনে থেকে সরে গেল। গত রাতের অগ্নি-সংকেতের কথা মনে পড়ল। পালাতে বলেছিলেন। সেই পালানোর মধ্যে সুধাময় নিজেও যে থাকবেন তা সে কী করে জানবে!

সায়ন ভারী পায়ে বেরিয়ে চারপাশে তাকাল। ভোরের রোদ-মাখা জঙ্গল এখন হাওয়ায় কাঁপছে। সে ধীরে-ধীরে সেই দিকটায় চলে এল, যে-দিকে যেতে সুধাময়ের নিষেধ ছিল। এবং সেখান থেকে সে স্পষ্ট দেখতে পেল। পাথুরে জমির ওপর কাল রাত্রে ওখানেই আগুন জ্বালানো হয়েছিল। এই অগ্নি-সংকেত থেকেই দূর-দূরান্তের মানুষ নিজের মতো করে অর্থ বুঝে নেয়। সুধাময় চাননি সায়ন এটা দেখুক।

হঠাৎ পায়ের শব্দ পেতেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে সায়ন হেসে ফেলল। হনুমানটা এক ছড়া কলা নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। সায়ন ওর মাথায় হাত বোলাতে বেচারা খুব খুশি হল। এবং তখন সায়নের মনে হল, মুখে-চোখে জল দেওয়া হয়নি। খিদেও পেয়েছে বেশ। সে চলে এল আবার গুহার ভেতরে। একেবারে শেষে সেই জল তোলার ব্যবস্থাটা এখনও আছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে গুহার মুখে বসে হনুমানটার সঙ্গে কলাগুলো ভাগ করে খেল। চা-বাগানে মা যখন ব্রেকফাস্টে কলা খেতে দিতেন তখন মোটেই ভাল লাগত না। কিন্তু এই কলাগুলোর আলাদা স্বাদ, হয়তো এই জঙ্গলের বাইরে পাওয়া যায় না বলেই। খাওয়া শেষ করে সে হনুমানটার দিকে তাকাল। বেচারা কেমন করুণ চোখে তাকাচ্ছে। ও কি বুঝতে পেরেছে ওর মালিক ওকে ছেড়ে চলে গেছে? সায়নের খুব মায়া হল। এই হনুমানটারও নিশ্চয়ই তার মতো কোনও সঙ্গী নেই। সে অত্যন্ত সাহসী হয়ে ধীরে-ধীরে হনুমানটার মাথায় হাত রাখল। প্রতিবাদ করতে গিয়েও করল না প্রাণীটা। শেষ পর্যন্ত নীরবে খানিকটা আদর খেয়ে লাফ দিয়ে চলে গেল ওপাশে।

সমস্ত শরীরে ময়লা জমেছে। জামা-প্যান্টের চেহারা দেখলে বোঝা যাবে না ওদের আসল রঙ কী ছিল! মা বলতেন, বেশি নোংরা হয়ে থাকলে চামড়ার রোগ হয়। চা-বাগানের অনেকের শরীরে সে-রকম দেখেছে সে। ব্যাপারটা ভাবতেই আতঙ্কিত হয়ে উঠল সায়ন। এই উঁচু পাহাড়ের গুহায় জল তুলে স্বচ্ছন্দে স্নান করতে পারে, জামা-প্যান্ট জলকাচা করে নিতে পারে। যতদূর মনে হচ্ছে, সুধাময় সেন আর এই গুহায় ফিরে আসবেন না। এখানে থাকলে রোদ জল ঝড়ে তার কোনও ক্ষতি হবে না। জঙ্গলে ফল আছে, বন্য পশু আছে, তাদের ধরার কায়দাটাও সে শিখেছে। অতএব কোনও ভয় নেই। আর এই গুহায় সাপ ছাড়া কোনও জন্তু উঠতে পারবে না। সাপের জন্যে তো হনুমানটা আছে। একটা অলস ভাবনা পেয়ে বসছিল যখন, তখন সম্বিৎ ফিরে পেল সায়ন। এ কী ভাবছে সে? এই গুহায় চিরজীবন থেকে যাবে নাকি? অসম্ভব। তাকে ফিরে যেতে হবেই।

সায়ন উঠে দাঁড়িয়ে জিভ দিয়ে দু'বার শব্দ করতেই হনুমানটাকে দেখা গেল। সায়ন বেশ মজা পেল। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে কেমন হয়? কাছে এগিয়ে গিয়ে সে ইশারায় নীচের দিকটা দেখাল। হনুমানটা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল। তৃতীয়বারে সে বুঝতে পেরে দড়িটা নামাতে লাগল নীচে। সায়ন দেখল এই ব্যাপারটা ও বেশ পটু হাতে করছে। দড়ি নামানো হয়ে গেলে সায়ন চারপাশে তাকাল। হাওয়ার দাপট ছাপিয়ে নদীর শব্দ কানে এল। বেশ জোরে স্রোত বইছে এখন। তার ওপাশে গভীর কালো জঙ্গল উঁচু-নিচু হয়ে দিগন্তে ছড়িয়ে গেছে। এই

একটি ঐতিহাসিক প্রকাশনা

জগদানন্দ রায়ের

বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থের যুগোপযোগী সংকলন

জগদানন্দ রচনা-সংগ্রহ

সম্পাদনা : অরূপরতন ভট্টাচার্য

দাম ৭৫·০০

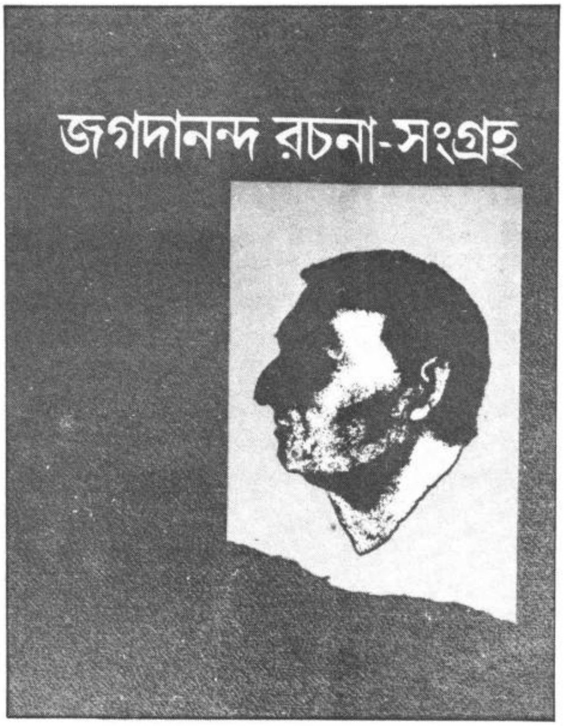

একটা সময় ছিল যখন বাংলা পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ মানেই লেখকের নাম জগদানন্দ রায়। জগদানন্দ রায়ের 'প্রকৃতি পরিচয়' গ্রন্থের ভূমিকায় এ-তথ্য জানিয়ে স্বয়ং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখেছিলেন, "বাঙ্গলাদেশে তাঁহার এই উদ্যমের সহযোগী অধিক নাই। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশের অবৈজ্ঞানিক পাঠকসমাজের মধ্যে বিজ্ঞানপ্রচারের জন্য যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তজ্জন্য বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নিকট ঋণী। কেননা, বাঙ্গলা সাহিত্য এ-বিষয়ে নিতান্ত দরিদ্র।"

সেই দারিদ্র্য আজও ঘোচেনি। আজও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। চর্চা বেড়েছে, কিন্তু লক্ষ্য সুদূর। অন্যদিকে জগদানন্দ রায়ের অমূল্য গ্রন্থগুলি ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠে অভাবকে করে তুলেছে ব্যাপকতর। মুখ্যত সেই দিকে তাকিয়েই এ-গ্রন্থের পরিকল্পনা। জগদানন্দ রায়ের অসামান্য কয়েকটি গ্রন্থকে দুই মলাটের মধ্যে এনে এ-যুগের পাঠকের সামনে তুলে ধরা। এতে শুধু যে বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার আদি ধারার সঙ্গে নতুন করে পরিচয় ঘটবে তা নয়, সাধারণ পাঠকের সর্বতোমুখী বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসারও সহজবোধ্য জবাব মিলবে জগদানন্দ রায়ের এই বৈচিত্র্যময় গ্রন্থাবলীতে। এই সংগ্রহ এক দিক থেকে 'বিজ্ঞান-কোষ' অভিধার যোগ্য।

যোগ্য, তার কারণ, বিজ্ঞানের বিশেষ কোনও শাখাকে অবলম্বন করে জগদানন্দ সাহিত্যের আঙিনায় আসেননি। পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা—সর্বত্রই ছিল তাঁর অবাধ, স্বচ্ছন্দ বিচরণ। গভীর তাঁর জ্ঞান, বিস্ময়কর তাঁর অধ্যয়নের পরিধি, তীক্ষ্ণ তাঁর পর্যবেক্ষণশক্তি, সমৃদ্ধ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এই দুর্লভ গুণাবলীর সঙ্গে রয়েছে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে, স্বাদু ভাষায়, সরস সহজবোধ্য রূপে উপস্থাপনার ক্ষমতা।

জগদানন্দ রায়ের যে-সাতটি গ্রন্থ নিয়ে এই সংগ্রহ সেগুলির নাম যথাক্রমে—প্রকৃতি পরিচয়, বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার, বিজ্ঞানের গল্প, গাছপালা, মাছ ব্যাঙ সাপ, বাংলার পাখী ও নক্ষত্র-চেনা। এ-সংগ্রহের মধ্য দিয়ে সাধারণ পাঠক ও বিজ্ঞানজিজ্ঞাসু কিশোরকিশোরীরা যাতে দশদিক সম্পর্কেই কৌতূহলী হয়ে ওঠেন সেদিকে যেমন দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি যাতে জগদানন্দ রায়ের রচনার আনুপূর্বিক পরিণতিও প্রত্যক্ষগোচর হয়ে ওঠে সেদিকেও ছিল সমধিক গুরুত্বদান। এই সংগ্রহকে সর্বাঙ্গীণ সুষ্ঠুরূপ দেবার জন্য কোনও চেষ্টার ফাঁক রাখেননি বিজ্ঞানে রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত উত্তরসূরী সম্পাদক। জগদানন্দ রায়ের এই সংগ্রহ যাতে তথ্যের দিক থেকে যুগোপযোগী হয়ে ওঠে সেদিকে তিনি প্রখর নজর রেখেছেন। পরবর্তীকালের গবেষণা ও আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে যে-সমস্ত তথ্য সামান্যতম সংশোধন প্রত্যাশী, সেই সমস্ত সংশোধন পরিশিষ্টে তিনি সংযোজিত করেছেন। এ-ছাড়াও পরিশিষ্টে যুক্ত করেছেন গ্রন্থ-পরিচয় ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-সংকলন। জগদানন্দ-কৃত পরিভাষার সঙ্গে এখনকার পরিভাষার সাদৃশ্য ও পার্থক্যও সেই সংকলনে ধরা পড়বে।

পুরনো ছবি ছাড়াও বর্তমান সংগ্রহে বহু নতুন ছবি ও রঙীন আর্টপ্লেট। সব দিক থেকে এ-গ্রন্থ এক ঐতিহাসিক প্রকাশনা।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড । ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা—৯

জঙ্গল ছাড়িয়ে তাকে যেতে হবে। সুধাময় আর তাঁর শয়তানের দল নিশ্চয়ই সতর্ক চোখে সর্বত্র নজর রাখছেন। কিন্তু উপায় নেই, মরুক বাঁচুক, তাকে ফিরতেই হবে। সায়ন ইশারায় কাছে ডাকল হনুমানটাকে। তারপর দড়ি ধরে নীচে নামতে লাগল। কিছুদূর আসার পর মুখ তুলে সে দেখতে পেল হনুমানটাও সরসর করে নেমে আসছে। এবং ওই গতিতে নামলে ওটা নির্ঘাত তার মাথায় আছাড় খাবে। কিন্তু কিছু বোঝার আগেই হনুমানটা আলতো পা তার কাঁধে রেখে সট্ করে নীচে নেমে গেল আর-একটা পাথর ধরে।

বালিতে দাঁড়িয়ে আর-একবার মাথা তুলে দেখল সায়ন। সত্যি একটা সুন্দর জায়গা খুঁজে বের করেছিলেন সুধাময় সেন। তিনি আজাদহিন্দ ফৌজের লোক হোন কিংবা না হোন, এই আস্তানাটা সত্যি নিরাপদ এবং ভাল। সায়ন এবার নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে লাগল। জলে ঢেউ ভাঙছে আর ছুটছে। এখানেও সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীটি আছে নাকি? একটি না একাধিক? যাকে দেখে ঘোড়া ভয় পায়, যে স্বচ্ছন্দে একটা মানুষকে নড়বার সুযোগ না দিয়ে তলায় টেনে নিয়ে যায়! অথচ, নদী পার না হয়ে তো চা-বাগানের দিকে যাওয়াও যাবে না। ঝিঁঝির শব্দ হচ্ছে একটানা। পাখি ডাকছে নানান স্বরে। হনুমানটার কথা মনে পড়ল সায়নের। ও কি আবার ফিরে গিয়েছে ওপরে? বেচারা নিশ্চয়ই আশা করছে সুধাময় সেন ফিরে আসবেন। সায়ন দু' পা ফিরে এল। এবং তখনই সে দেখতে পেল, একটা গাছের ডালে বসে আছে হনুমানটা সতর্ক চোখে তার দিকে তাকিয়ে। সায়ন হাসল। তারপর জিভে দু'বার শব্দ করতেই হনুমানটা লাফিয়ে নামল। সায়নকে অবাক করে এগিয়ে গেল সামনে। যেন পথ চিনিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল! সায়ন তাকে অনুসরণ করল। অবশ্য এ ছাড়া কোনও পথ নেই। সে চাইছিল এমন একটা জায়গা, যেখানে স্রোত কম এবং জল হাঁটুর নীচে। তা হলেই সে পার হবার ঝুঁকি নিতে পারে।

হনুমানটা মাঝে-মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। এই পথ খুব একটা ব্যবহার করা হয় না। তাই চলতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। এগিয়ে গিয়ে সায়ন তাকে ডাকতেই সে আবার চলা শুরু করছিল। তবে পায়ে হাঁটার চেয়ে এখন সে এ-গাছ থেকে ও-গাছে লাফিয়ে যাওয়াই বেশি পছন্দ করছিল। শেষ পর্যন্ত জায়গাটা খুঁজে পাওয়া গেল। পাথর দেখা যাচ্ছে জলের তলায়। হঠাৎ উঁচু জমি পাওয়ায় স্রোতটা থেমে গেছে। চওড়াও বেশি নয়। সায়ন খানিকক্ষণ পারে দাঁড়িয়ে লক্ষ করল, কিছু দেখা যায় কি না। কয়েকটা চুনোমাছের ঝাঁক ছাড়া কিছুই নজরে এল না। জলের প্রাণীটা নিশ্চয়ই বেশ বড়। তার পক্ষে কি এত কম জলে আসা সম্ভব হবে? আর ওর যদি কোনও সঙ্গী না থাকে তা হলে এতক্ষণ তো পেট ভর্তি হয়ে থাকার কথা। খিদে না পেলে আক্রমণ করবেই বা কেন? সায়ন হনুমানটাকে কাছে ডাকল। প্রাণীটা জলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বিচিত্র শব্দ করে কিছুটা সরে দাঁড়াল। অর্থাৎ ও জলে নামতে চায় না। সায়নের মনে পড়ল ঘোড়াটার কথা। সেটাও এইরকম জলে নামতে চায়নি। বন্য জন্তুরা অনেক বেশি বুঝতে পারে! কিন্তু সাদা চোখে সায়ন তো কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। একটা বিশাল ঈগলজাতীয় পাখি একটা পাক দিয়ে কর্কশ গলায় ডেকে ওপাশের গাছে

গিয়ে বসল। সায়ন হাত বাড়িয়ে হনুমানটাকে ডাকল। তার মনে হচ্ছিল ও সঙ্গে থাকলে ভাল হয়। একা যাওয়ার চেয়ে চেনা প্রাণীর সঙ্গ সাহস বাড়াবে। ওর সঙ্গে ইতিমধ্যে যে বন্ধুত্বটুকু হয়েছে তাতে কি এই দাবি সে করতে পারে না? হনুমানটা নড়ল না। তখন সায়ন ওর কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসল। হনুমানটা তার চোখের দিকে তাকিয়ে বোধহয় মতলব বোঝার চেষ্টা করছে। সায়ন ইশারায় নিজের কাঁধ দেখাতে সে কিছুক্ষণ সময় নিল। তারপর দোনামনা করে সায়নের কাঁধে চেপে বসল। শরীরের ওজন বেশ, কিন্তু হনুমানটা এমন কায়দা করে বসেছে যে, সায়নের অসুবিধে হল না উঠে দাঁড়াতে। কিন্তু এমন উৎকট গন্ধ বের হচ্ছে প্রাণীটার শরীর থেকে যে, বমি হয়ে যাবার জোগাড়! জলে নামল সায়ন। চোরা স্রোত আছে, জল যতই কম হোক না কেন! তবু যতটা সম্ভব দ্রুত পা ফেলতে লাগল সে। ভয়ে বুক ঢিপঢিপ করছে। জল দেখে হনুমানটা এমন ঘাবড়েছে যে, দু'হাতে তার মাথা আঁকড়ে ধরেছে, যাতে পড়ে না যায়।

জল পার হয়ে এল সায়ন। বুকের ধকধকানিটা তখনও কমেনি। না, কোনও আলোড়ন হয়নি জলে। এপারে এসে হনুমানটা কাঁধ ছেড়ে সরাসরি একটা গাছের ডাল ধরল লাফিয়ে। নিশ্চিন্তিতে যখন সায়ন নিশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক তখনই তার বুকে থম্ ধরল। পলকেই নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল যেন। সামনেই একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালো পোশাক পরা ন্যাড়া-মাথা। তার মুখের একটা কোণে ঘাসের ডগা বেরিয়ে আছে। অন্য প্রান্তটি নির্বিকার ভঙ্গিতে চিবিয়ে যাচ্ছে সে। চোখ স্থির। এবং সেই

দৃষ্টিতে এমন বরফের স্পর্শ যে, শিউরে উঠল সায়ন। সে ধরা পড়ে গেছে। এখন আর পালাবার কোনও পথ নেই। তখনই পেছনের জলে আলোড়ন উঠল। শব্দটা কানে যাওয়া মাত্র পা ভারী হয়ে গেল। অর্থাৎ পিছনের নদীতে প্রাণীটি এসে গেছে ইতিমধ্যে। হনুমানটা চিৎকার করছে প্রাণপণে।

এবার ন্যাড়া-মাথা সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর ইশারা করল ওকে অনুসরণ করতে। সায়ন বুঝতে পারছিল না কী করবে। সে জড় পদার্থের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ লোকটা ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে অজানা ভাষায় কিছু চিৎকার করতেই তার সম্বিৎ ফিরল। সমস্ত শরীরে কাঁপুনি নিয়ে সে লোকটাকে অনুসরণ করল।

সায়ন বুঝতে পারছিল তার কী হতে যাচ্ছে। এই শয়তানগুলোর প্রাণে কোনও দয়ামায়া নেই। দু-দুটো মানুষকে নির্দ্বিধায় খুন করেছে তারা। কিন্তু এই লোকটা কি একা? ওর সঙ্গীরা কোথায়? পেছন থেকেই বুঝতে পারল প্রচণ্ড শক্তি ধরে শয়তানটা। সমস্ত শরীরে এক ফোঁটা চর্বি নেই। লোকটা হেঁটে যাচ্ছে কিন্তু একবারও পিছনে তাকাচ্ছে না। অর্থাৎ ও ধরেই নিয়েছে, তাকে অনুসরণ করা ছাড়া সায়নের কোনও উপায় নেই।

সায়ন কথাটা নিজেও বুঝতে পেরেছে। নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। হঠাৎ সে শক্ত হয়ে গেল। বোকার মতো সে প্রাণ দেবে না। তাকে বাঁচার চেষ্টা করতেই হবে!

পনেরো জোড়া শকুনের চোখ ওর দিকে তাকিয়ে। সায়ন হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করল একটি বৃত্তের মধ্যে। বৃত্তটি রচনা করেছে কালো পোশাক ন্যাড়া-মাথার মানুষগুলো। প্রত্যেকের চোয়ালের নীচে কিছু আছে; নড়ছে যখন তখন মনে হয় চিবোচ্ছে। যে লোকটি তাকে নিয়ে এসেছিল সে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বৃত্তে মিশে গেল। এখন সায়ন ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে। তার চারপাশে সবাই। জায়গাটা একটু ন্যাড়া ধরনের। গাছপালার মাঝখানে মানুষের টাকের মতো। সামান্যই। জঙ্গলের যাবতীয় শব্দাবলী বাজছে আবহসঙ্গীতের মতো। কেউ কোনও কথা বলছে না, কিন্তু দৃষ্টিও সরছে না।

হঠাৎ একজন উঠে দাঁড়াল। লোকটাকে সেই উৎসবের সময় দেখেছে সায়ন। নিরীহ ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে হাতের উলটো পিঠ দিয়ে এমন একটা চড় মারল আচম্বিতে যে, সায়নের মনে হল পৃথিবীটা অন্ধকার, তার শরীর ওপরে উঠে যাচ্ছে এবং তারপরই মাটিতে আছড়ে পড়ল সে। চেতনা যায়নি কিন্তু অস্বচ্ছ বোধের মধ্যে সায়ন চাপা হাসির শব্দ শুনতে পেল। সে চোখ খুলতেই দেখতে পেল, লোকটা নির্বিকার ভঙ্গিতে একটা ধারালো ছুরি বের করছে। জিভে নোনতা স্বাদ, জ্বালা সত্ত্বেও সায়ন বুঝতে পারল, সে মারা যাচ্ছে। এখনই তাকে মেরে ফেলা হবে। এবং সে যতই চেষ্টা করুক, এখান থেকে পালাবার কোনও পথ নেই।

ঠিক সেই সময় একটা ছায়া ধীরে-ধীরে এগিয়ে এল কাছে। তারপর গম্ভীর স্বরে কিছু বলতেই, ছুরিধারী মাথা নেড়ে চলে গেল সামনে থেকে। সায়ন ছায়াটাকে নিচু হতে দেখল। এবং তখনই সে দ্বিতীয়বার শিউরে উঠল। সুধাময় সেন দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "বিশ্বাসঘাতক!" (ক্রমশ)

ছবি: অনুপ রায়

আজ প্রমিস ব্যবহার ক'রে হাজার হাজার পরিবার চিরকালের ব্যবহৃত
লবঙ্গ তেলের
গুণ তো বুঝছেন!
প্রমিস
আপনিও দেখুন না ব্যবহার ক'রে?

প্রমিস
- দাঁতের ক্ষয় রোধ করে,
- মুখে আনে সুস্বাদ, আর
- দূর করে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ।

বিশ্বের স্বর্ণপদক বিজয়ী

সুস্থ-সবল দাঁত ও মাড়ি আর নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য

বালসারা উৎপাদন

CHAITRA-BLS-668 BEN

টুয়া দেখল, বাণী আর খুশিকে কেউ খেতে ডাকছে না...

টুয়ার জন্মদিন

কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়

"কুড়ি টাকায় আমার জন্মদিন হবে না ?" টুয়া কথাটা বলতেই সবাই হেসে উঠল। "সত্যি বলছি, আমার কুড়ি টাকা জমেছে।" টুয়া ওর বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, "বাপি, এবার তোমাকে কিচ্ছু খরচ করতে হবে না। যা হবার তা আমার টাকা দিয়েই হবে।"

মা, ঠাকুমা আর বাবা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। ওঁদের হাসিতে টুয়া খানিকটা দমে গেল।

এমন সময় ডিং-ডং শব্দে কলিং-বেলটা বেজে উঠতেই টুয়া ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দেখল, ছোটমাসি আর ছোটমেসো। ওখান থেকেই চিৎকার করে বলল, "ঠাকুমা, মা, দ্যাখো কারা এসেছে।"

ইতিমধ্যে ছোটমাসি আর ছোটমেসো ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছেন। তাঁরা এসে বসতেই টুয়া ছোটমেসোর কোল ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। বাবা বললেন, "টুয়া কী বলছে শুনেছ।" বলেই আবার হাসতে শুরু করলেন।

টুয়া বলল, "এত হাসির কী আছে ! ছোটমেসো, আমি ঠিক করেছি আমার জন্মদিনে এবার আমি সবাইকে খাওয়াব। জানো তো, আমার না কুড়ি টাকা জমেছে। তুমি বলো না, তাতে হবে না ?"

ছোটমেসো বললেন, "নিশ্চয়ই হবে। তুমি কী-কী খাওয়াবে ঠিক করেছ ?"

"ফ্রায়েড-রাইস, মাংস, দই আর মিষ্টি।"

"বাহ্, দারুণ। এর পরেও তো তোমার আরও টাকা থাকবে। তা দিয়ে কী করবে ?"

টুয়া একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, "ছোটমেসো, তুমি তো আইসক্রিম ভালবাস, তা হলে আইসক্রিমও খাওয়াব।"

"বেশ, তবে তো খুব ভাল হয়।"

টুয়া আনন্দে হাততালি দিয়ে একপাক নেচে বলল, "কী মজা ! কী মজা !"

এই জন্যেই ছোটমেসোকে এত ভাল লাগে টুয়ার। একটু কথা বললেই মনটা কেমন ভাল হয়ে যায়। কত সুন্দর গল্প বলেন। এই সব গল্প ক্লাসের বন্ধুদের বলে তাক লাগিয়ে দিয়েছে টুয়া। সবাই অবাক হয়ে বলে, 'আমরাও তো তোর সঙ্গে ফাইভে পড়ি, কেন যে আমরা বলতে পারি না !' টুয়া হাসে আর ভাবে সবার কি আর তার মতো ছোটমেসো আছে।

ছোটমেসো বললেন, "এবার জন্মদিনে তুমি কী নেবে ?"

টুয়া বলল, "তুমি আমাকে শুধু বই দেবে। বই। ব্যস্, আর কিচ্ছু চাই না।"

ছোটমেসো হেসে বললেন, "তাই হবে।"

"তা হলে আগামী রোববার আমার জন্মদিনে তোমার আর ছোটমাসির নিমন্ত্রণ রইল।" কথাটা বলেই টুয়া মা, ঠাকুমা আর বাবার দিকে তাকিয়ে দেখল প্রত্যেকের মুখে সেই রকম হাসিটা এখনও আছে। "বিচ্ছিরি," বলে সে ছোটমাসি আর ছোটমেসোর মাঝখানে বসে পড়ল।

টুয়া শেষ পর্যন্ত জমানো কুড়ি টাকা বাবার হাতে তুলে দিল। সে না-হয় জমানো টাকাটা দিতে পারে, কিন্তু দোকান-বাজার আরও নানারকম ঝক্কি-ঝামেলা কি আর সামলাতে পারবে। তবে শেষ পর্যন্ত ঠিক হল ভাত হবে। সে যাই হোক, টুয়া আর সেসব নিয়ে মাথা ঘামায়নি। পায়েসও হবে। জন্মদিনে পায়েসের কথাটা টুয়ার একেবারে মনেই ছিল না। ভালই হল। ছোটমেসো পায়েস খুব ভালবাসেন।

বড়মেসো, মাসি আর জয় তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন। অফিসের গাড়িও এনেছেন সঙ্গে। বড়রা ইতিমধ্যেই ঠিক করেছেন সন্ধেবেলা গাড়ি করে কোথাও ঘুরতে যাওয়া হবে। টুয়ার অবশ্য কোথাও যাবার ইচ্ছে নেই। বড়মেসো অফিসের

গাড়ি বলেকয়ে যেদিন আনতে পারেন সেদিন বড়দের মধ্যে কেমন যেন হ্যাংলার মতো ভাব এসে যায়। বড়মেসো গাড়ি দেখাবার জন্য সবাইকে নিয়ে ঘুরতে বেরোন। এত লোকজনের মধ্যে যেন দমবন্ধ হয়ে আসে টুয়ার। তার চেয়ে ছোটমেসো এলে গল্প শোনা অনেক ভাল।

ছোট ঘরে পান্তু, মিমি, জুনা, অর্ঘ্য সবাই হৈ-চৈ করছে। টুয়া জয়কে নিয়ে বন্ধুদের কাছে গেল। নানারকম গল্প, খেলা। তারপর যারা আসছে সকলেই 'হ্যাপি বার্থ ডে' বলে টুয়ার যা কিছু প্রিয় তা হাতে তুলে দিচ্ছে। এই সবের মধ্যে দারুণ খুশিতে দিনটা এগিয়ে যাচ্ছে। টুয়া কান খাড়া করে রেখেছে, দরজার কাছে কোনও কথা হলেই সে ছুটে যাচ্ছে। দেখল, ফুলকাকু কাকিমা আর লারা এলেন। লারাকে ছোঁ মেরে নিয়ে ছোট ঘরে বন্ধুদের কাছে গেল।

ছোটমাসি একসময় এলেন।

টুয়া তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ বাদে বলল, "মাসি, ছোটমেসো কোথায় ? এখনও এল না !"

"আসবে। একটা জরুরি কাজ আছে। একটু দেরি হবে আসতে।"

কান্নার ভঙ্গিতে ঠোঁট উল্টে এল টুয়ার। ছোটমাসি তা লক্ষ করে কাছে টেনে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "আসবে মা আসবে, কিন্তু এসে যদি দেখে তার টুয়ার সোনার মুখটা আষাঢ়ের মেঘ, তা হলে কি ভাল লাগবে ?"

টুয়া ফিক করে হেসে ফেলল।

বাণীকে দেখে ছুটে এসে হাত ধরল টুয়া। বলল, "দ্যাখো না বাণীদি, কেউ আমাকে সাজিয়ে দিচ্ছে না। তুমিও কাজে এমন ব্যস্ত যে তোমাকেও বলতে পারছি না। আমাকে সাজিয়ে দেবে চলো।" তারপর বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোরা একটু বোস্। আমি এক্ষুনি আসছি।"

বাণী বড়মাসির বাড়িতে কাজ করে। বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় যখন সবাই পালিয়ে আসছিল, তখন বাড়ির সবাইকে হারিয়ে ফেলে বাণী একা-একা ঘুরছিল। তাই দেখে বড়মাসি আশ্রয় দেন। সেই থেকে আছে। বড়মাসি বড়মেসো দুজনেই চাকরি করেন। গোটা বাড়িটা আর জয়ের দায়িত্ব এখন ওর ওপর।

টুয়াকে বাণী বলল, "কেমন করে সাজবে বলো।"

টুয়া বলল, "আমি কিছু বলব না। তুমি যেমন সাজাবে সেটাই ভাল।"

বাণী হাসল। সাজার মাঝখানে খুশি এল এক গ্লাস দুধ আর বিস্কুট নিয়ে। বলল, "টুয়া, এটা লক্ষ্মী মেয়ের মতো খেয়ে নাও তো দেখি চটপট।"

খুশি টুয়াদের বাড়িতে কাজ করে। ক্যানিংয়ের দিকে বাড়ি। বছরে সেখানে দু'বার যায়। টুয়ার মা কাজ করে স্কুলে। ঠাকুরমার সঙ্গে সারাদিন বাড়ি আর টুয়ার ভাল-মন্দ দেখাশোনা করে সে।

দুধ খেয়ে গ্লাসটা খুশির হাতে দিয়ে টুয়া বলল, "খুশিদি, বাণীদি, আজ কিন্তু তোমরাও সাজবে।"

বাণী বলল, "পাগলি মেয়ে, আমরা আবার সাজব কী রে ! আমাদের কত কাজ। আমাদের কি আর সাজবার সময় আছে ?"

"আমি কিন্তু তা হলে আমার সব সাজ নষ্ট করে ফেলব। তোমাদের সঙ্গে কথা বলব না।"

বাণী, খুশি দুজনেই চুপ করে রইল।

টুয়া বলল, "তোমাদের দুজনের দুটো সুন্দর জামা আছে না ? জামা কি জমিয়ে রাখবার জিনিস। আজ আমার জন্মদিনে তোমাদের সাজতে ইচ্ছে করছে না !"

বাণী আর খুশির চোখ ছলছল করে উঠল।

একটু বাদেই ওরা জামা পরে চুল বেঁধে এল।

টুয়া ওদের দেখে বলল, "তোমাদের দুজনকেই ফুলের মতো দেখাচ্ছে।"

বাণী বলল, "টুয়া, দ্যাখো কে এসেছে।"

টুয়া দেখল ছোটমেসো। হাতে বই। সে ছুটে গেল।

টুয়ার বন্ধুদের সবার খাওয়া হয়ে গিয়েছে। বড়রা সবাই খেতে বসেছে। ভাত ফুরিয়ে গিয়েছিল। রান্নার ঠাকুরকে আবার ভাত করতে বলা হয়েছে। হয়ে এসেছে প্রায়। টুয়া দেখল বাণী আর খুশি এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের কেউ খেতে ডাকছে না।

টুয়া মাকে বলল, "মা, বাণীদি আর খুশিদি এখনও খেতে বসল না, কখন খাবে ওরা ?"

মা বললেন, "ওদের ভাত তো এখনও রান্না করেনি বোধহয়।"

টুয়াদের বাড়িতে কাজের লোকের জন্য খুব কমদামি চাল রান্না হয়। বারান্দায় পাখা থাকলেও গরমের মধ্যে ওরা পাখা চালিয়ে শুতে পারে না। বড়মাসির বাড়িতেও তাই। টুয়ার খুব মন খারাপ হয়ে যায়। ওদের বাড়িতে এক-একটা অনুষ্ঠানে যে পরিমাণ খাবার নষ্ট হয়ে যায়, মাঝে-মাঝে বড়রা এমন বেহিসেবি খরচ করে, সেই সব যদি কিছুটাও বন্ধ করা যেত তা হলে বাড়ির কাজের লোকের জন্য কখনও কমদামি চাল রান্না করতে হত না। আজ তার জন্মদিন। এই দিনে ওদের জন্যও একই চাল রান্না হলে কী এমন বেশি খরচ হত। সকলেরই কত বড়-বড় চিন্তা দেশের গরিব মানুষদের নিয়ে। অথচ এই বড়রাই যে কেন ছেলেমানুষের মতো কাজ করেন বোঝা যায় না। টুয়ার মনে হল, তার জমানো কুড়ি টাকায় এত সব হয়ে গেল, ওদের কি আজকের দিনের জন্য ভাল ভাত খাওয়ানো যেত না !

মা বললেন, "কী রে খুশি, দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? তোদের চালটা বসিয়ে দে। ভাত না হলে খাবি কী ? আশ্চর্য !"

টুয়া দেখল বাণী স্টোভ জ্বেলে জল বসাল। খুশি একটা কৌটো থেকে চাল নিয়ে ধুয়ে আনল।

বড়রা খাচ্ছেন। সাদা ফুলের পাপড়ির মতো ভাত সকলের পাতে। এটা দাও, সেটা দাও বলে দারুণ হৈ-চৈ।

স্টোভে বসানো জল সবে ফুটতে শুরু করেছে। চাল ছেড়ে সেই দিকে তাকিয়ে আছে বাণী আর খুশি। যে মুখ দুটোকে আজ ফুলের মতো মনে হয়েছিল, টুয়া দেখল সেই দুটো ফুল কী এক কষ্টে একটু-একটু করে মলিন হয়ে যাচ্ছে।

ছবি : দেবাশিস দেব

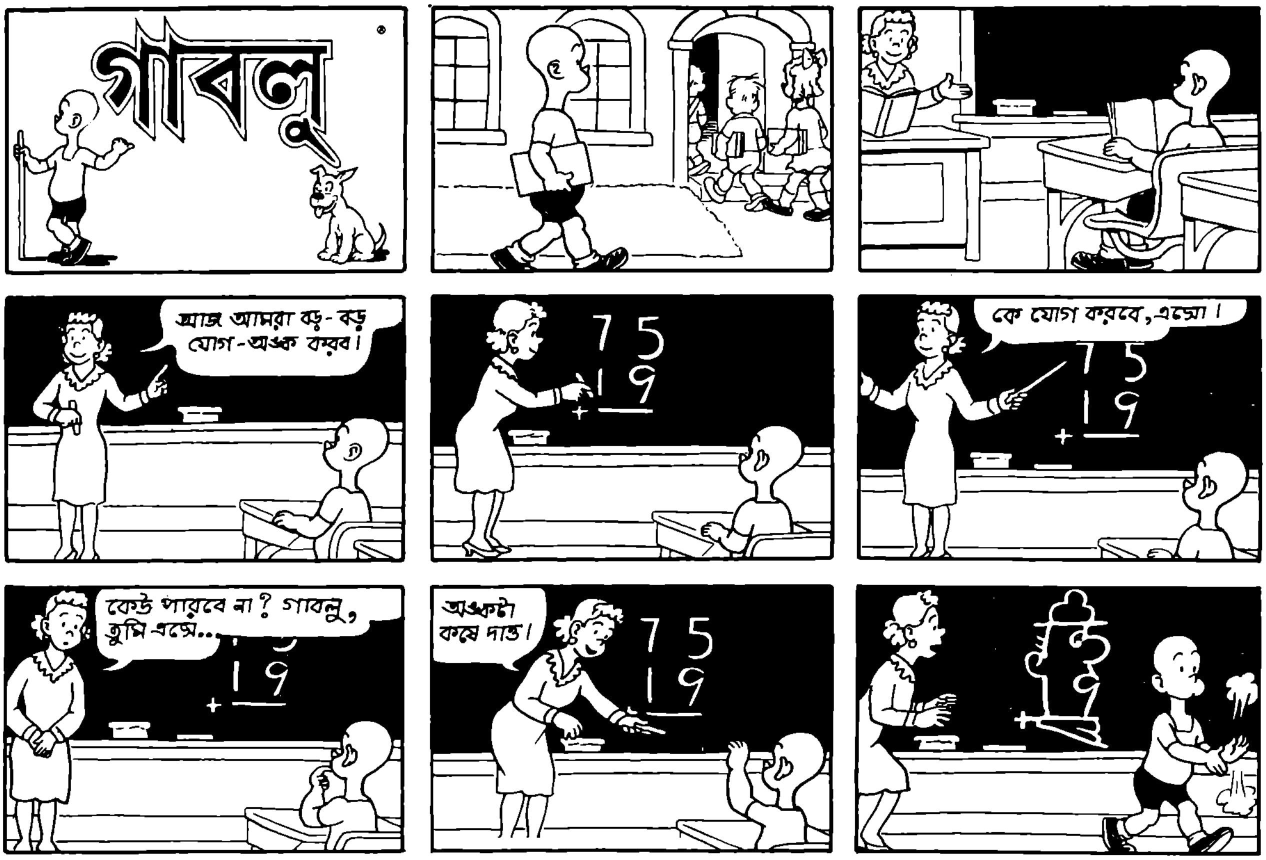

গাবলু
আজ আমরা বড়-বড় যোগ-অঙ্ক করব।
75
19
+
কে যোগ করবে, এসো।
কেউ পারবে না? গাবলু, তুমি এসো...
অঙ্কটা কষে দাও।

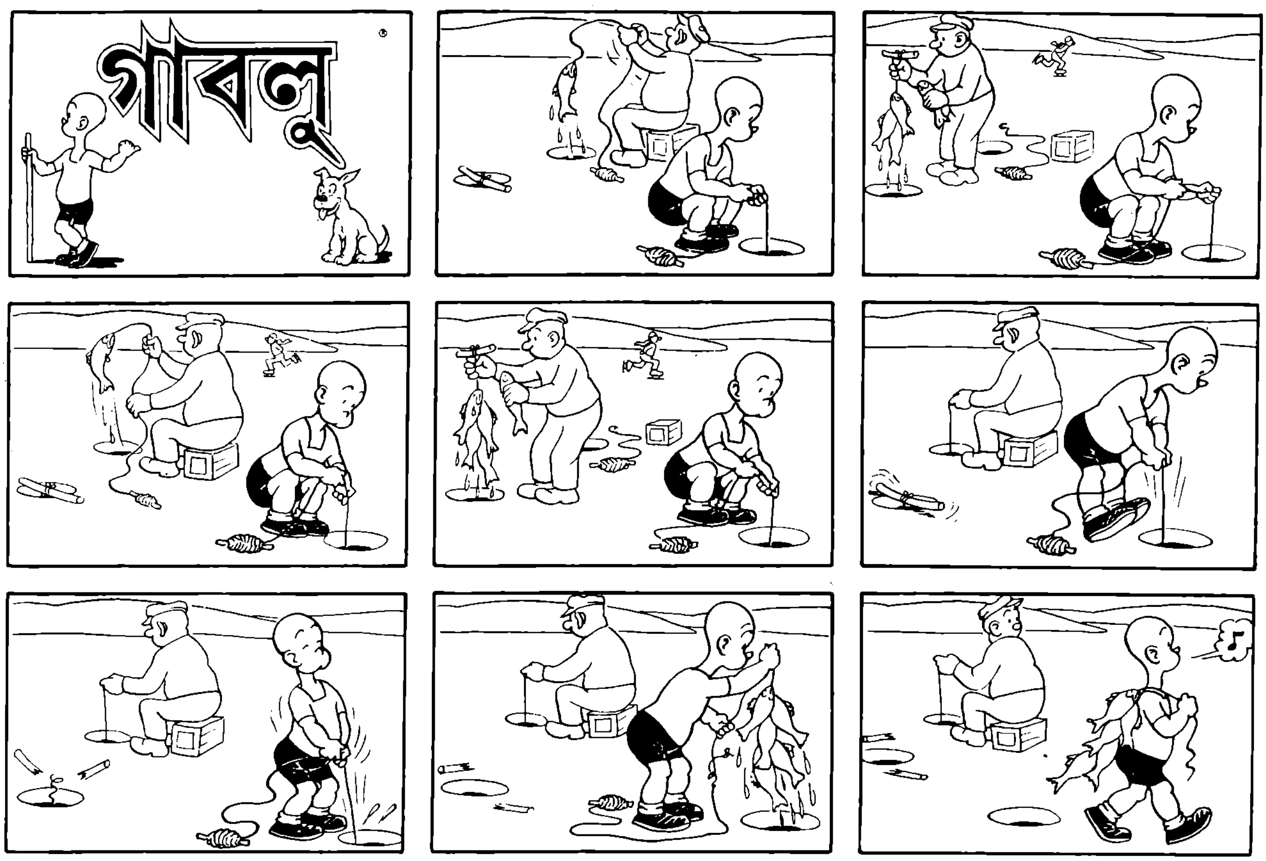

গাবলু

ধাঁধা

পর পর কয়েকটা ছুটির দিন। ক্যালেণ্ডার জুড়ে লাল তারিখ। ফলে, ছোট্‌কাকে যে কলকাতায় পাওয়া যাবে না, আমি আগেই জানতাম। তাই আগের রবিবার দুপুরেই ছোট্‌কার ঘরে হানা দিলাম।

রোদ্দুরে গা ছড়িয়ে দিয়ে ইজিচেয়ারে আধ-শোয়া অবস্থায় বিশ্রাম করছিল ছোট্‌কা। ঘুমোয়নি। ছোট্‌কা যে দুপুরে ঘুমোয় না, এটা অবশ্য সবাই জানে। শুয়ে-বসে কাটায়, হাতে সবসময় থাকে কোনও-না-কোনও বই।

এদিনও তাই ছিল। আমাকে দেখে হাতের বইটা মুখের সামনে থেকে সরিয়ে রাখল ছোট্‌কা। বইয়ের মলাটটা একপলক দেখেই বুঝলাম, তেমন গুরুগম্ভীর কিছু বই নয়। বেড়ানোর একটা গাইড-বুক। রঙচঙে ওই মলাটটা এর আগেও চোখে পড়েছে।

ছোট্‌কা বলল, "বাইশ তারিখ রাত্রে যাচ্ছি দিল্লি। ওখান থেকে যাব রাজস্থান। দিল্লিটা অফিসের কাজে, রাজস্থানটা বেড়াতে। আর, ফিরব সেই জানুয়ারির শেষে। এর মধ্যে রাজস্থানি মুক্তো নিয়ে একটা ছোট্ট ধাঁধা দিয়ে যাব তোকে। ফিরে এসে উত্তর মেলাব। ঠিক আছে?"

ঠিক যে আছে, আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বুঝে নিয়েছে ছোট্‌কা। তাই সঙ্গে-সঙ্গে খাতা-কলম খুলে আমি বসে গেছি। ছোট্‌কা বলে গেছে ধাঁধাটা।

প্রথম ধাঁধা ॥ সাতাশটা মুক্তোর দানা। বেশ বড় সাইজের। মটরের দানার মতন। এর মধ্যে ছাব্বিশটাই সমান ওজনের। একটি মাত্র ওজনে ভারী। বাইরে থেকে অবশ্য কিছুতেই বোঝার জো নেই, কোন্‌টার ওজন বেশি, সব কটা মুক্তোই এক মাপের।

তা, সেটাই বার করতে হবে। একটা নিখুঁত দাঁড়িপাল্লায় মাত্র তিনবার ওজন করে বলে দিতে হবে, কোন্ মুক্তোটার ওজন বেশি। বাটখারা পাবে না, শুধু মুক্তোগুলোকেই ওজন করতে হবে দাঁড়িপাল্লায় চাপিয়ে।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ ১৬ জানুয়ারি ১৯৪১ কোন্ দিক থেকে স্মরণীয় দিন?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও— পাকর্শ্বিরিপা

গতবারের উত্তর ॥ (১) গঙ্গোপাধ্যায় ঔপন্যাসিক, মিত্র নাট্যকার, হাসির গল্প লেখেন চট্টোপাধ্যায়, সরকার প্রাবন্ধিক, মুখোপাধ্যায় কবি ও চক্রবর্তী ভ্রমণকাহিনীকার। (২) জবা। (৩) পরশুরাম, রাজশেখর বসুর ছদ্মনাম।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

১		২	৩	৪		৫
	■	৬			■	
৭	৮	■		■	৯	
১০		■		■	১১	
■		■		■		■
১২		■		■	১৩	১৪
১৫			■	১৬		

সংকেত : পাশাপাশি : (১) পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা (৬) পাখিবিশেষ, ওলটালে অন্য অর্থ। (৭) নশ্বর (৯) রাহুল ছিলেন বুদ্ধপুত্র, তাঁর মাতা কে—দিলাম সূত্র (১০) কড়া। (১১) কানের নিম্নাংশ (১২) অতীতের বিখ্যাত মল্ল। (১৩) শত্রু। (১৫) গানের তালবিশেষ। (১৬) আকাশচারী।

উপর-নীচ : (১) আগুনে পাথর (২) ফলবিশেষ। (৩) কাল্পনিক পাথর। (৪) তরল বস্তু, ওলটালে জমাট। (৫) আর একটি ফল। (৮) প্রাচীনকালের যুদ্ধবাদ্য। (৯) মসলাবিশেষ। (১২) বোকামি করলে বড়দের কাছে কোন্ জন্তুর নামে গালাগাল খাও? (১৪) ভবন, নগর, গ্রাম—তিনটেই বোঝায়।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

ক	চু	রি	■	বি	ক	চ
পো	লো	■	■	■	ই	ন্দ্র
তা	■	ম	গ	ধ	■	ভা
ক্ষ	মা	■	ন্ধ	■	না	গা
■	ন	দী	মা	তৃ	ক	■
না	দ	■	দ	■	ছা	তি
গ	ণ্ড	■	ন	■	বি	ল

রঞ্জন

মজার খেলা

এবারের মজার খেলার জন্য চাই সতেরোটি পোড়া দেশলাইকাঠি, অথবা চাই সতেরোটি টুথপিক। যেটা জোগাড় করা সহজ, করে ফেলো।

করেছ ?

বেশ। এবার কাঠিগুলোকে টেবিলের উপর সাজাও, নীচে দেখানো ভুল অঙ্কের মতন—

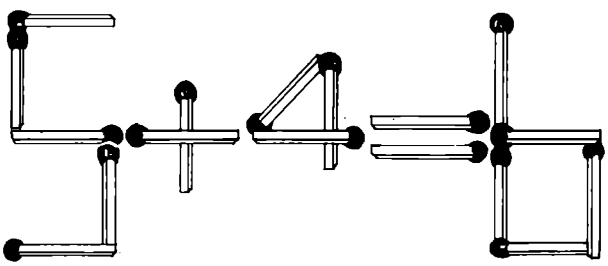

কী লেখা হল বলো তো ? ৫+৪=৬। পরিষ্কার ভুল অঙ্ক একটা, তাই না ?

হ্যাঁ। আর, এই ভুল অঙ্কটাকেই একটা ঠিক অঙ্কের চেহারা দিতে হবে। সেটা দিতে হবে মাত্র একটি কাঠিকে এক জায়গা থেকে তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় বসিয়ে।

সুতরাং লেগে পড়ো। নিজে তো আগে সমাধানটা বুদ্ধি খাটিয়ে করো। তারপর যদি মনে হয় এটা বেশ মজার, তখন না-হয় বন্ধুদের সামনে এটা দেবে।

কিন্তু নিজেরই যদি উত্তর না হয়, তা হলে ? তা হলে তো মজাটাই মাটি।

তা কি আর হতে দেওয়া যায় ! তাই নীচে একটা সমাধান দেখানো রইল। নিতান্ত নিজে না পারলে তখন দেখো।

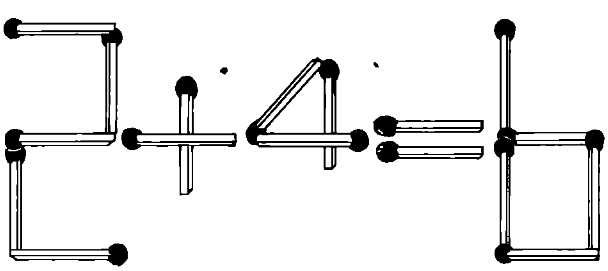

দারুণ। তাই না ?

মজারু

হাসিখুশি

"বলছ ওই ডাক্তারের খুব হাতযশ। তা বুঝলে কী করে ?"

"ডাক্তারবাবুর চেম্বারের দেওয়ালে অতগুলো নরকঙ্কাল ঝোলানো দেখেও বুঝতে পারব না ?"

"যদু, মধু আর হরি, বলো তো মোট ক'জন হল বাবাই ?"

তিনজনও হতে পারে, আবার দশজনও হতে পারে স্যার। ধরুন, হঠাৎ ওদের মধ্যে কেউ আহ্লাদে আটখানা হল, তখন ?"

তিন ঘণ্টা সমানে বকবক করে অতিথি বাড়ির কর্তাকে বললেন, "এবারে উঠতেই হবে। অনেকক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করলাম। তবে চমৎকার সময় কেটেছে। মাথায় যে-যন্ত্রণাটা ছিল, কখন তা হারিয়ে গেছে।"

নিস্পৃহ গলায় গৃহকর্তা বললেন, "কে বলল হারিয়ে গেছে ! আমি তা খুঁজে পেয়েছি।"

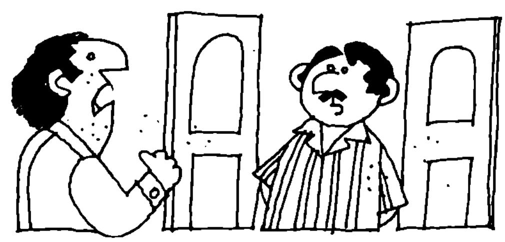

"মৌর্য সাম্রাজ্যের কথা পড়তে বললাম, আর তুমি অভিধান খুলে বসলে ?"

"মৌর্য বানানটাই যে জানি না স্যার।"

"চারদিকে যা বসন্ত হচ্ছে, বসন্তের টিকা নিয়েছ তো বুকাই ?"

"বসন্তের টিকা নেব কেন ? এখন তো শরৎকাল।"

"বলছেন ডার্করুমের কাজ জানেন, আগে কোথাও কাজ করেছেন ?"

"করব না কেন ? অনেক জায়গায় করেছি। রাত্রিবেলা ঘরে সিঁদ দিয়ে জিনিসপত্র বের করে আনাই তো আমার কাজ।"

ছবি : দেবাশিস দেব

ধোলাইয়ের পর ধোলাই...প্রতি ধোলাই !
পাওয়ার প্যাক্ড সার্ফ -এর ধোলাই এমন সাদা, যেন নতুন !

প্রতিটি শার্ট, প্রতিটি চাদর রাখে তেমনিই তাজা, তেমনিই ধবধবে সাদা……যেন সদ্য কেনা প্যাকেট থেকে বার করা।

কারণ, পাওয়ার প্যাক্ড সার্ফ এখন আগের চেয়ে অনেক ভালো…… অনেক শক্তিশালী, অনেক রক্ষাকারী। এতে রয়েছে এমন শক্তি যা কাপড়ের গভীরে পৌঁছে সাফ করে. আর এখন এতে ফেনাও রয়েছে অনেক বেশী।

সার্ফ কাপড়ের বেয়াড়া ময়লাও তুলে বার করে দেয় – তাই শুভ্রতাও হয় দীর্ঘস্থায়ী—আর, সার্ফ কাপড় রাখে সুরক্ষিত……সবসময় নতুনের মত। সাদা, রঙীন, বিশিষ্ট বা আটপৌরে—সবকিছুকেই সার্ফ করে রাখে—সবচেয়ে উজ্জ্বল, সবচেয়ে সাদা……নতুনের মত সদাসর্বদা !

ধোলাইয়ের তো হাজার পাউডার আছে, কিন্তু পরিবারের সবার জামাকাপড়ের জন্যে আপনার ভরসাযোগ্য হ'ল – একমাত্র সার্ফ !

সার্ফের ধোলাই সবচেয়ে সাদা, কাপড় নতুন দেখায় সদা!

হিন্দুস্থান লিভারের উৎকৃষ্ট উৎপাদন

LINTAS SU 332 2719 BG

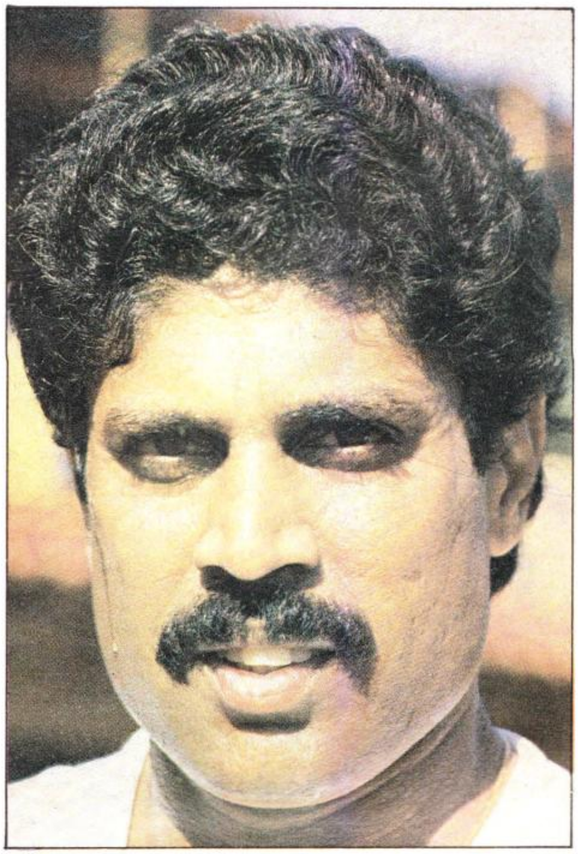

কপিলদেব (ম্যান অব দি ম্যাচ)

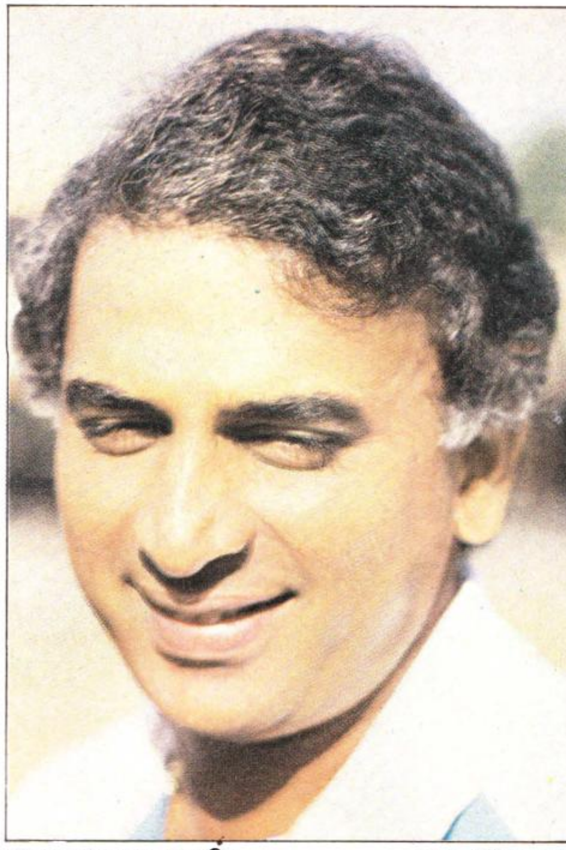

গাওস্কর (৩১তম সেঞ্চুরি)

ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

আই. এফ. এ. শিল্ড জয়ী উরুগুয়ের পেনারোল ফুটবল-দল

ফোটো : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্ড গেল বাইরে

অশোক রায়

দুর্বল লড়াই দিয়ে আই· এফ· এ· শিল্ড ধরে রাখা গেল না। ফুটবল বলতে আমাদের যাবতীয় মোহ তিনটি ক্লাব, মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডানকে কেন্দ্র করে। নেহরু কাপে বিদেশী দলের খেলা দেখে আমরা প্রথম বুঝেছিলাম সত্যিকারের ফুটবল কী। এবার আই· এফ· এ· শিল্ডের খেলা দেখার পর আবার বুঝলাম বিশ্ব-ফুটবলের মানচিত্রে আমরা কোন্ বিন্দুবৎ জায়গায় আবদ্ধ। আমরা সত্যিই কত অল্প। একথা সত্যি, রাশিয়ার শাখতোর (এটাই ওদের মুখে শোনা ঠিক উচ্চারণ), কিংবা উরুগুয়ের দুটি টিম আহামরি নয়। কিন্তু কলকাতার ক্লাবগুলোর তুলনায় ওরা সব দিক দিয়েই উন্নত। বল ধরা, ছাড়া, স্পিড, কন্ট্রোল সব ব্যাপারেই ওরা আমাদের থেকে বেশ কয়েক কদম এগিয়ে।

৮টি দলকে নিয়ে দুটি গ্রুপে ভাগ করে কোয়ার্টার ফাইনাল লিগের খেলাগুলি শুরু হয়েছিল সল্ট লেক স্টেডিয়ামে। 'এ' গ্রুপে ছিল রাশিয়ার শাখতোর, উরুগুয়ের পেনারোল, মহমেডান এবং পুরুলিয়া ক্লাস্টার বিজয়ী দল খিদিরপুর। 'বি' গ্রুপে ছিল নির্বাচিত উরুগুয়ে একাদশ, ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং বার্নপুর ক্লাস্টার বিজয়ী দল বি· এন· আর·। বেশ মনে আছে প্রথম দিকে তিনটি বিদেশী দলের খেলা দেখার পর অনেকেই মন্তব্য করেছিলেন, এগুলো কোনও টিমই নয়। ভাবখানা ছিল, এইসব টিম আমাদের তিন প্রধানের কাছে স্রেফ নস্যি। সম্ভবত, গত নেহরু কাপে বিদেশী দলগুলির বিস্ময়কর ফুটবল দেখার পর থেকেই কারও-কারও ধারণায় অন্য দল সম্পর্কে এক ধরনের অশ্রদ্ধা জন্মেছে। আবার বলছি, নেহরু কাপের মতো দল না হলেও এদের ফুটবল-মান আমাদের থেকে উন্নত।

কোয়ার্টার ফাইনাল লিগের শেষে 'এ' গ্রুপ থেকে প্রথম দুটি স্থান পায় শাখতোর এবং পেনারোল। তিনটি ম্যাচে শাখতোর সব কটিই জিতে পায় ৬ পয়েন্ট। তারা গোল দেয় ১০টি এবং হজম করে ১টি। পেনারোল পায় ৪ পয়েন্ট। শাখতোরের কাছে তারা হারে পরিষ্কার ৩-০।

বি গ্রুপে ইস্টবেঙ্গল এবং নির্বাচিত উরুগুয়ে দল এক ও দু' নম্বর জায়গা দখল করে। ইস্টবেঙ্গল ও উরুগুয়ের মধ্যে খেলাটা শেষ হয় অমীমাংসিতভাবে। লিগে দু' দলের কেউই কোনও গোল খায়নি। ইস্টবেঙ্গল করে মোট ৬টি গোল। তবে বি গ্রুপের সবচেয়ে জমজমাট খেলা হয় ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ। এ-বছর ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের মধ্যে খেলা হয়েছে দু'বার। ফেডারেশন কাপে ইস্টবেঙ্গল জিতেছিল। লিগের প্রথম খেলা ড্র। এর পরে মোহনবাগান রোভার্স এবং ডুরান্ড কাপ জেতে। কিন্তু দুটি টুর্নামেন্টেই ইস্টবেঙ্গল গরহাজির থাকায় লড়াইটা হয়নি। দু' পক্ষের কাছেই, সুতরাং, শিল্ডের খেলাটি মর্যাদার লড়াই হয়ে পড়েছিল। উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল ২-০ গোলে হারায় মোহনবাগানকে। ইস্টবেঙ্গল-উরুগুয়ে ম্যাচটিও হয়েছিল গতিময়। তবে এ ম্যাচে কোনও দলই গোল পায়নি।

সেমিফাইনালে কলকাতা ফুটবলের চ্যালেঞ্জ জানাতে একমাত্র দল হিসেবে হাজির ছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু আগাগোড়া ম্যাচটা দুর্দান্ত খেলেও পেনারোলের কাছে টাইব্রেকারে হার মানে তারা। নির্ধারিত সময়ে খেলার ফল ছিল ১-১। টাইব্রেকারে ইস্টবেঙ্গলের চারটি শটের মধ্যে চিন্ময় এবং সুদীপ গোল করতে পারেননি। পেনারোল অবশ্য চারটি শটেই ভাস্করকে হার মানায়। ইস্টবেঙ্গল হারে ৫-৩ গোলে। ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে দুর্দান্ত খেলেন সুদীপ চ্যাটার্জি।

দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে উরুগুয়েকে ১-০ হারিয়ে ফাইনালে পেনারোলের মুখোমুখি হয় শাখতোর। ৯৩ বছরের শিল্ডের ইতিহাসে এই প্রথম ফাইনালে গেল দুটি বিদেশী দল।

ফাইনালে নিঃসন্দেহে শাখতোরেই ছিল ফেভারিট। গ্রুপ লিগের খেলায় তারা পেনারোলকে হারিয়েছিল তিন গোলে। কিন্তু ফাইনালে জিতে গেল পেনারোলই, হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য মনে হলেও। আগাগোড়া ম্যাচটা একের পর এক আক্রমণের ঢেউ তুলে গেল শাখতোর। কিন্তু একটা মাত্র পালটা আক্রমণে গোল করে গেল পেনারোল। খেলার শেষে শাখতোরের কোচকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "এই ম্যাচ তোমরা জিততে পারলে না কেন?" খুব চমৎকার জবাব দিয়েছিলেন কোচ নোসভ. "সুযোগ পেয়েও যারা কাজে লাগাতে পারে না, জয় তাদের জন্য নয়।"

ফাইনালে পেনারোল গোল দেবার পরের মুহূর্ত ফোটো : সন্তোষ ঘোষ

থার্টিওয়ান চিয়ার্স

মণীশ মৌলিক

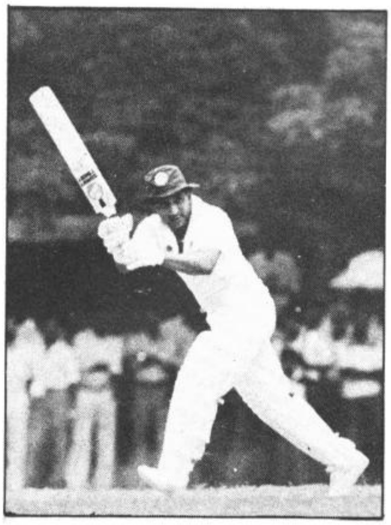

অপেক্ষা করতে হল দু'বছর। ঠিক দু'বছর নয় অবশ্য। বারোদিন কম। অর্থাৎ, ব্রাডম্যানের রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড তৈরি করার পর ঠিক ৭১৮ দিন পর আরও একটি টেস্ট সেঞ্চুরি হল। একত্রিশ! একত্রিশ!

এ ক'দিন বড় অশান্তিতে ছিল ক্রিকেট-প্রেমিকরা। সেঞ্চুরি করাই যাঁর প্রিয়তম কর্ম, তিনি যদি শতরান করতে না পারেন, তবে অবস্থাটা কী দাঁড়ায়, সহজেই অনুমেয়। সুউচ্চ প্রত্যাশাও কঠিন ঘা খেতে খেতে এক সময় মাথা নামিয়ে ফেলে। ভারতবাসীর প্রত্যাশারও সেই হালই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'ওয়ান ডে ওয়াণ্ডার্স', সদ্যঃপ্রকাশিত নতুন বইটিতে, সানি খোলাখুলি লিখেছেন, রোহন গাওস্করেরও বিরক্ত হয়ে ওঠার কথা। জন্মদিনে সে তার বাবাকে, বেনসন অ্যাণ্ড হেজেস ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপসে, অন্তত শূন্য না করতে অনুরোধ করেছিল। বালকের করুণ অনুরোধ। গাওস্কর ছেলের জন্মদিনে কিছু রান করেছিলেন। কিন্তু সেঞ্চুরি? রোহনের মতো আমাদেরও অপেক্ষা করতে হল অনেকদিন। তিরিশ এবং একত্রিশের মধ্যে দূরত্ব এতখানি, জানা ছিল না।

সে যাই হোক, অ্যাডিলেড ওভালে অমরত্বের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে গেলেন সুনীল মনোহর 'রেকর্ড-ব্রেকার' গাওস্কর। একত্রিশতম টেস্ট সেঞ্চুরি, অপরাজিত ১৬৬। ইনিংসের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যাট করেছেন ক্যারিয়িং দ্য ব্যাটের সম্মানটা অবশ্য পাবেন না। কারণ, ক্রেগ ম্যাকডারমটের বলে বাঁ হাতের কনুইতে আঘাত পেয়ে মাঝে তিনি বিশ্রাম নেওয়ার জন্য প্যাভিলিয়নে ছিলেন। তা হোক, একত্রিশ নম্বরটা তো এসে গেছে। আমাদের পক্ষে সেটাই বড় খবর।

খবর কি আর একটা? অনেক। ন'হাজার রানও পূর্ণ হল তাঁর। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের আগে সানির মোট রান ছিল ৮৮৪০। ইনিংসে ১৬০ রানে পৌঁছনোমাত্র টেস্টে সুনীলের ৯০০০ রান পূর্ণ হয়। নবগঠিত নাইন থাউজ্যাণ্ড ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, ট্রেজারার, মেম্বার—সবই ওই একজন, গাওস্কর। কেননা, টেস্টে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের অধিকারী ভদ্রলোকের নাম জিওফ্রে বয়কট। এবং তাঁর সংগ্রহ ৮১১৪।

অ্যাডিলেডের দর্শকদের ভারী আক্ষেপ ছিল। সুনীল গাওস্কর দুনিয়ার মাঠে-মাঠে সেঞ্চুরি করে বেড়ান, কিন্তু এখানে একটা পঞ্চাশও করতে পারেননি। এবারে আক্ষেপ পুষিয়ে দিয়েছেন গাওস্কর। প্রত্যাশা মেটাতে, অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর সর্বোচ্চ রান উপহার দিলেন সানি। যাদব ধৈর্য হারিয়ে না ফেললে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের পক্ষে সর্বোচ্চ একক সংগ্রহের রেকর্ডটিও সানির দখলে এসে যেত। ওই রেকর্ডটি আপাতত সন্দীপ পাটিলের ব্যাটে বাঁধা আছে, ১৭৪।

অনেকেই অবশ্য ভুরু কুঁচকেছেন, ৫৫১ মিনিট বড় বেশি সময় নিয়েছেন সানি। আরে, তাতে ক্ষতিটা কী? ম্যাচ তো মরে গিয়েছিল আগেই। বৃষ্টি আর ব্যাড লাইটে দফারফা। সেই ম্যাচ থেকে সময় নিয়ে, যদি একত্রিশতম সেঞ্চুরিটা খুঁড়ে নেওয়া হয়, তাতে রাগ করার কোনও কারণ থাকা উচিত নয়। এ ছাড়া মনে রাখতে হবে, সানি সম্পূর্ণ সুস্থও ছিলেন না। ফোলা বাঁ হাত নিয়ে খেলেছেন, ব্যাণ্ডেজসহ। অমন চোট নিয়েই সেঞ্চুরি। ভেবে দ্যাখো, চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। হাজামজা নীরস ম্যাচটাতে অনেক গুরুত্ব যুক্ত হয়েছে গাওস্করের ওই ইনিংসের দৌলতে।

থার্টিওয়ান চিয়ার্স।

প্রথম টেস্ট ঝিমিয়ে গেল

সম্রাট রায়

আশা ছিল অ্যাডিলেডে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট জমবে। কিন্তু জমল না। বাদ সাধল বৃষ্টি। অনেকখানি মূল্যবান সময় বৃষ্টিতে নষ্ট হওয়ায় প্রথম টেস্ট শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতভাবেই শেষ হল। এই ম্যাড়মেড়ে টেস্ট থেকেই ভারত অবশ্য ফিরে পেল তার দুই সেরা ক্রিকেটার—গাওস্কর এবং ক্যাপ্টেন কপিলদেবকে, ফর্মের চুড়োয়। আসছি সে-কথায়।

টসে হেরেও অস্ট্রেলীয় ইনিংসে প্রথম ধাক্কাটি মারেন ভারত-অধিনায়ক কপিলদেব। ওপেনার ওয়েন ফিলিপস (২১) ফিরে যাবার পর-পরই বিনি ফেরত পাঠান টেস্টে প্রথম খেলতে-আসা জিওফ মার্শকে (৫)। অস্ট্রেলিয়াকে অতঃপর ভাঙনের হাত থেকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন অধিনায়ক অ্যালান বর্ডার এবং ডেভিড বুন। তৃতীয় উইকেটে মূল্যবান ৯১ রান যোগ করে বর্ডার (৪৯) আউট হলেও বুনের সঙ্গে জুটি বাঁধলেন গ্রেগ রিচি। চতুর্থ উইকেটেও যোগ হল ১১৭ রান। নিজস্ব ১১তম টেস্ট খেলতে নেমে সেঞ্চুরি (১২৩) পেলেন বুন। তাসমানিয়ার পক্ষে তিনিই প্রথম ক্রিকেটার, টেস্টে সেঞ্চুরি করলেন, এবং তাও ওপেনারের অনভ্যস্ত জায়গায়। শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে সংগ্রহ করল ৩৮১ রান। গ্রেগ রিচিও হাঁকালেন একটি সেঞ্চুরি (১২৮)। নিষ্প্রাণ উইকেটে অস্ট্রেলিয়াকে এই রানে বেঁধে রাখলেন ভারতের অধিনায়ক কপিলদেব। কারা যেন বলেছিল, কপিলদেব ফুরিয়ে গেছেন! দু-দুবার হাঁটুতে অস্ত্রোপচারের ফলে কপিলদেব একটু কমজোরি হয়ে পড়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু প্রতিভাবানদের জন্ম যে ফুরিয়ে যাবার জন্য নয়, সেটা আরেকবার প্রমাণ করলেন কপিলদেব। যে-পিচে ব্যাটসম্যানরা 'আউট হব না' মনে করলে অনন্তকাল ব্যাট করে যেতে পারেন, সেই 'মৃত' পিচ থেকেই কপিল কুড়িয়ে নিলেন ১০৬ রানে ৮ উইকেট। '৮৩ সালে আমেদাবাদে কপিলদেব শক্তিশালী ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ৮৩ রানে ৯ উইকেট পেয়েছিলেন। কপিল জানিয়েছেন, "সেখানে পিচ আমাকে সাহায্য করেছিল। আর এখানে পিচ ছিল ঘুমন্ত। তাই এই বোলিংই আমার সেরা বোলিং।"

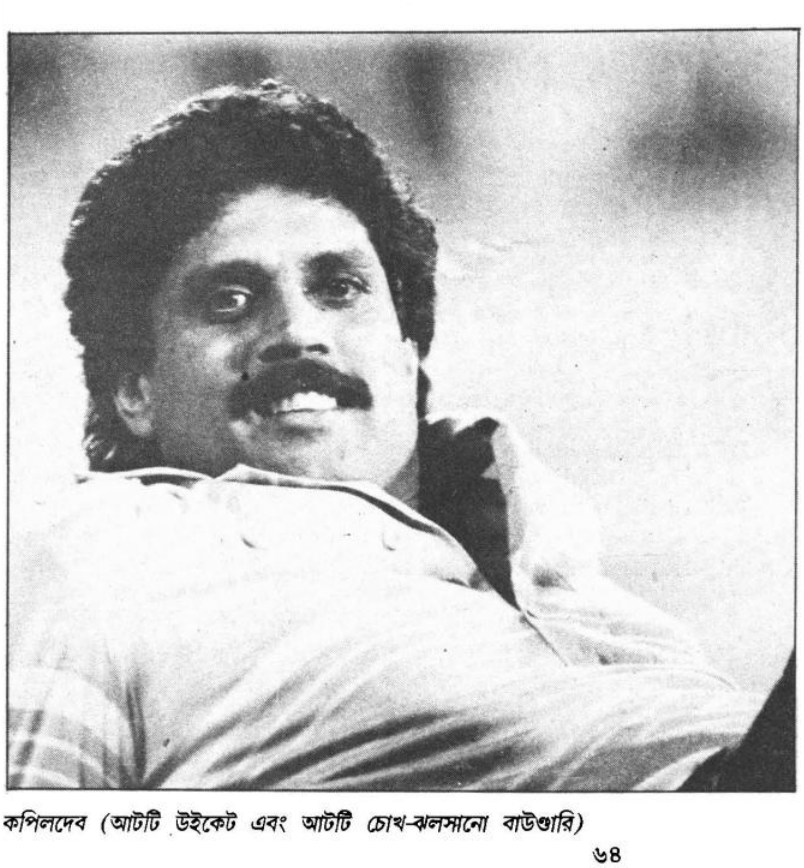

কপিলদেব (আটটি উইকেট এবং আটটি চোখ-ঝলসানো বাউণ্ডারি)

পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা প্রায় তিন দিন ধরে উইকেটে হামাগুড়ি দিয়ে খুঁটে-খুঁটে সংগ্রহ করলেন ৫২০ রান। ম্যাচটাকে মেরে ফেলা হল একটু-একটু করে। কপিলদেব (৩৮) ছাড়া আর কেউই বিপক্ষ - বোলিংকে আক্রমণ করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলেন না। মাঠে উপস্থিত সামান্যসংখ্যক দর্শকের কাছে তো বটেই, এমনকী সার ডন ব্রাডম্যান, যিনি প্রথম দিকে খেলা দেখতে এসেছিলেন, বিরক্ত হয়ে পরে আর মাঠেই আসেননি। সত্যিই তো, পয়সা খরচ করে যাঁরা মাঠে আসেন, তাঁরা এই খেলা দেখবেনই বা কেন! ধরা যাক, যদি ইডেনে অস্ট্রেলিয়ার সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান গ্রেগ চ্যাপেল চার দিন ধরে ঠুকঠুক করে ব্যাট করে দেড়শো রান করতেন, বহু কষ্টে টেস্টের টিকিট জোগাড় করেছেন যাঁরা, তাঁদের কি ব্যাপারটা খুব ভাল লাগত?

আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা গাওস্কর প্রায় দু' বছর পরে টেস্টে আবার সেঞ্চুরি পেলেন। তাঁর সেঞ্চুরির সংখ্যা দাঁড়াল ৩১। কিন্তু তার চেয়েও বড় ব্যাপার, বিশ্বক্রিকেটে তিনিই প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে টেস্টে ৯,০০০ রান করলেন। দীর্ঘ ৫৫১ মিনিটে তিনি রান করেন ১৬৬ নট আউট।

দু' পক্ষে মোট তিনটি সেঞ্চুরি হলেও 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ'-এর পুরস্কার কিন্তু পেলেন কপিলদেব। শুধু অসাধারণ বল করার জন্যেই নয়। ব্যাট হাতে উইকেটের চারদকে ৮টি চোখ-ঝলসানো বাউণ্ডারি হাঁকিয়ে ৩৮ রান করে মরা ম্যাচে প্রাণ ফেরানোর আন্তরিক চেষ্টারই পুরস্কার।

ঢাকায় বড়দিনের উপহার

রাজা গুপ্ত

আনন্দ হচ্ছে না এ-কথা বলা যাবে না। কারণ '৬২ সালে জাকার্তায় এশিয়ান গেমস থেকে ফুটবলে ভারতের সোনা জেতার পরে দীর্ঘ ২৩ বছরের ক্লান্তিকর অপেক্ষার অবসান ঘটল। দক্ষিণ এশীয় গেমস এবং এশিয়ান গেমস এক ব্যাপার নয়। তবু সোনা তো।

টুর্নামেন্টে ভারতই ছিল কাগজে-কলমে সবচেয়ে শক্তিশালী দল। জিতলে তেমন কিছু প্রশংসা না পাওয়ারই কথা। কারণ দুর্বল দলের বিরুদ্ধে জয়কে কেউই গুরুত্ব দেবেন না, এটা জানা ছিল। সেই সঙ্গে অবশ্য এটাও জানা ছিল যে, পরাজিত হলে সমালোচনার হুল ফোটাতে কেউ ছাড়বেন না।

হ্যাঁ, এই চাপ নিয়েই ভারত প্রথম ম্যাচে নামে নেপালের বিরুদ্ধে। ঢাকায় সাফ গেমসে যোগ দেবে বলে নেপাল এক মাস ধরে ব্রাজিলীয় কোচের তালিম নিয়েছে। তা ছাড়া নেপালই ছিল গতবারের বিজয়ী দল। কিন্তু ভারত তাদের পক্ষে একটু বেশিই ভাল টিম। পরিষ্কার দু-গোলে তারা হারায় নেপালকে। দুটি গোলই করেন শিশির ঘোষ। ন' মাস আগে প্রি-ওয়ার্ল্ড কাপে ভারতের হয়ে খেলতে নেমে এইখানেই শিশির তাঁর জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক গোলটি পেয়েছিলেন। ভারতের দুই নতুন স্টপার বেনি এবং মস্তান কিন্তু বেশ ভালই খেললেন। ফরোয়ার্ড লাইনে কৃশানু পায়ের কাজে টুকরো টুকরো করলেন নেপালি ডিফেন্স। দুটি গোলই হল তাঁর পাস থেকে।

কৃশানু দে (পায়ের কাজ চমৎকার)

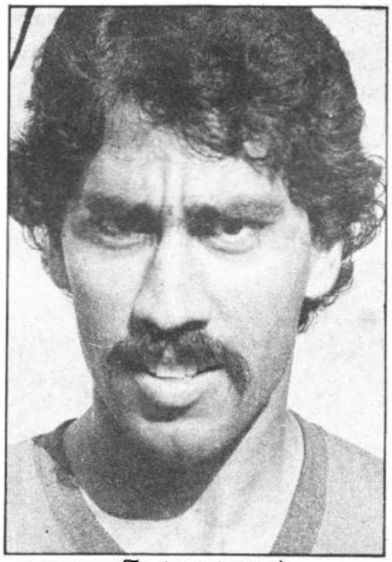

প্রশান্ত ব্যানার্জি (পুরনো চমক)

ভুটানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচেও ভারত জিতল। এবার ৩-০। খেলার ফল দেখে অবশ্য বোঝা যাবে না যে, আন্তর্জাতিক ফুটবলে মাত্র দু'বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে ভুটান কী দুর্দান্ত খেলেছে। ভারত প্রথমে ঠিক করেছিল ভুটানের বিরুদ্ধে পুরোশক্তির দল নামাবে না। কিন্তু নেপালের বিরুদ্ধে ভুটানের খেলা দেখে তারা সিদ্ধান্ত বদল করে। ভারতের তিনটি গোলের মধ্যে দুটি বাবু মানির, অন্যটি শিশিরের।

ভারত ফাইনালে গেল। অন্য দিক থেকে ফাইনালে উঠল বাংলাদেশ, ঠিক আগের ম্যাচে মালদ্বীপকে ৮-০ গোলে হারিয়ে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যেই

যে ফাইনাল হবে, এটা বোঝা যাচ্ছিল। এর আগে চারবার এই দুটি দেশ পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে। এবং চারবারই জিতেছে ভারত। পঞ্চম সাক্ষাৎকারের ফলাফল নিজেদের অনুকূলে রাখার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে মাঠে নামল বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ফরোয়ার্ড লাইনটি বেশ শক্তিশালী। দুই উইঙ্গার মামনবাবু ও ওয়াসিম এবং স্ট্রাইকার আসলাম উঁচুদরের ফুটবলার। তবে ডিফেন্সটা তাদের কিছুটা দুর্বল। ভারতই প্রথম গোল করে শিশিরের মাধ্যমে। মানির কর্নার কিক শূন্যে বাঁক নিয়ে গোলকিপার মহসিনকে টপকে চলে আসে ডান দিকে ফাঁকায় দাঁড়ানো শিশিরের কাছে। শিশির শুধু বল ঠেলে দেন গোলে। কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে গোল শোধ করে দেয় বাংলাদেশ। পেনাল্টি বক্সের বাইরে থেকে আচমকা জোরালো শটে খেলায় সমতা ফেরালেন স্ট্রাইকার আসলাম। অতঃপর ১২০ মিনিট (অতিরিক্ত সময়সহ) ধরে দু' পক্ষই ব্যর্থ চেষ্টা করে গেল গোল করার। খেলা গড়িয়ে যায় টাইব্রেকারে। টাইব্রেকারে ভারতের পক্ষে ৪টি শটে গোল করেন কৃষ্ণেন্দু, দেবাশিস মিশ্র, কৃশানু এবং প্রশান্ত। বাংলাদেশের পক্ষে একমাত্র গোল পান কাইজার। আসলামের শট বাঁচান অতনু, এবং ইউসুফের শট উড়ে যায় বাইরে। দারুণ রকম উল্লসিত হবার মতো ব্যাপার নয়, কিন্তু দীর্ঘ ২৩ বছর পরে আর্ন্তজাতিক আসর থেকে ভারত ফুটবলের সোনা জিতল, এই আনন্দটুকুই বা কম কিসে? এটাই এবারে বড়দিনের উপহার।

টেস্ট-ক্রিকেট ছাড়লেন জহির

নৃপতি চৌধুরী

ব্যাট তো নয়, যেন রানের ফুলঝুরি। যে-কোনও পরিস্থিতিতেই ব্যাট হাতে ক্রিজে এসে দাঁড়ানো মানেই বোলারের দফা গয়া। ব্যাট ঘুরতে শুরু করল। সেই সঙ্গে ঘুরতে শুরু করল স্কোরবোর্ডের চাকাও। এই হলেন জহির আব্বাস। 'রান-মেশিন' ব্রাডম্যানের সঙ্গে তুলনা করে তাঁকে বলা হত 'এশিয়ান ব্রাডম্যান'।

১৯৭৮ সালে বেদির অধিনায়কত্বে দীর্ঘ দিন পরে পাকিস্তান সফরে যায় ভারত। সিরিজে ভারত হারে ০-২ ব্যবধানে। ভারতীয় বোলিংকে নিয়ে প্রায় ছেলেখেলা করেছিলেন জহির। তিন টেস্টে একটি 'ডবল' এবং একটি সেঞ্চুরিসহ তাঁর রান ছিল ৫৮৩ (গড় ১৯৪·৩৩)। তিন টেস্টের সিরিজে এত রান আর কোনও ক্রিকেটারের ব্যাটে এসেছে বলে মনে পড়ে না।

১৯৭৯-'৮০ মরসুমে জহির আসেন ভারত সফরে। আমরা এই বিরাট ক্রিকেটারের ব্যাট দেখার অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু পরপর পাঁচটা টেস্টে দারুণভাবে ব্যর্থ হওয়ার পরে কলকাতা টেস্টে জহির নিজেই সরে দাঁড়িয়েছিলেন। পেশাদার ক্রিকেটের যুগে অধিকাংশ ক্রিকেটার যেখানে আর্থিক স্বার্থ-চিন্তা ছাড়া চলেন না, সেখানে দলের স্বার্থে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে জহির মহৎ একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

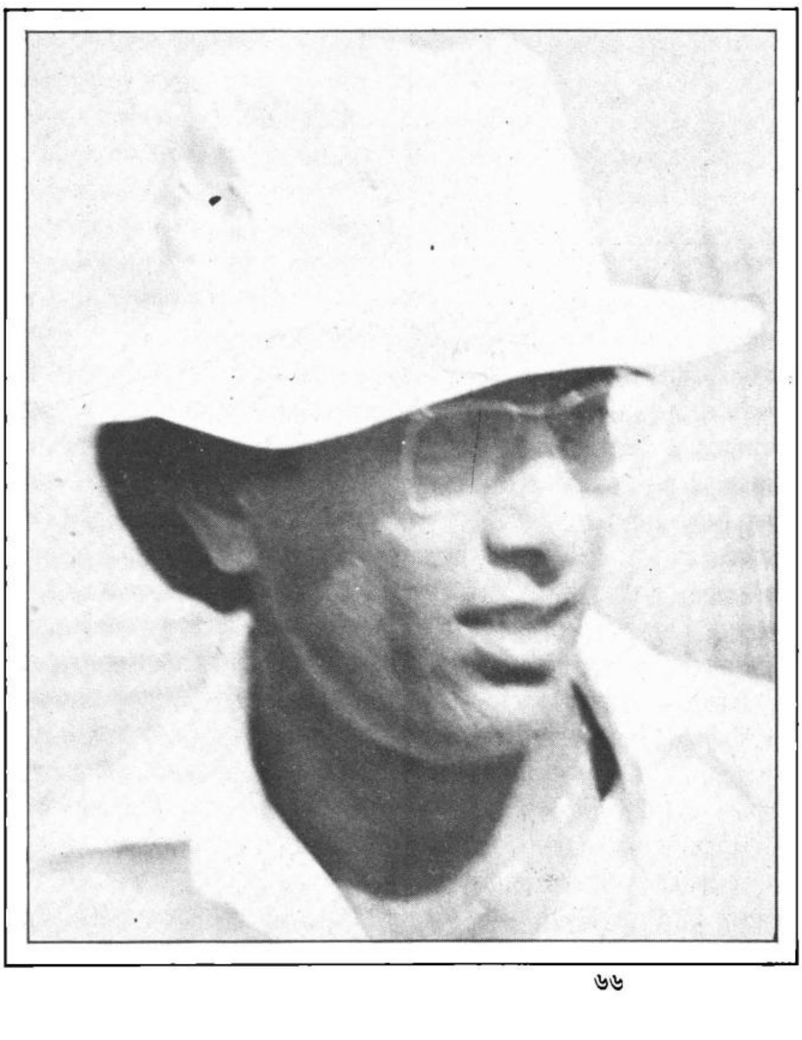

১৯৮২-'৮৩ মরসুমে ভারত আবার যায় পাকিস্তান সফরে। ইমরানের দুর্ধর্ষ বোলিং ছিঁড়ে ফেলে ভারতকে ৩-০ মার্জিনে। জহির সিরিজে একটি ডবল এবং দুটি সেঞ্চুরিসহ রান করেন ৬৫০ (গড় ১৩০)। যদিও '৮৩ ভারত সফরে তাঁর ব্যাট আবার রান সংগ্রহে ব্যর্থ হয়।

১৯৮৪ সালে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের মাটিতে জহির আবার জ্বলতে শুরু করেন। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুতে ভারতীয় দল মাত্র দুটি টেস্ট খেলার সুযোগ পায় সেখানে। ওই দুই টেস্টেই জহিরের ব্যাট ঝলসে ওঠে ১৯৪ রানের গড় নিয়ে।

এই পর্যন্ত পড়বার পর মনে হতে পারে জহির বুঝি শুধু ভারতের বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তানের মাটিতেই বড়-বড় রান করেছেন। ১৯৭১ সালে ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে প্রথম টেস্টেই জহির হাঁকিয়েছিলেন ২৭৪ রান। টেস্টে সেটাই ছিল তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি। ১৯৭৪ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে আবার ডবল সেঞ্চুরি (২৪০) করেন জহির।

এই সেঞ্চুরি এবং ডবল সেঞ্চুরির প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে আটবার দু-ইনিংসে সেঞ্চুরি করে অবিশ্বাস্য বিশ্ব-রেকর্ড গড়েছেন জহির। চারবার তিনি দু-ইনিংসেই সেঞ্চুরি করেন যার মধ্যে প্রথম ইনিংসে রয়েছে একটি করে দ্বি-শতাধিক রানের ইনিংস (২১৬ ও ১৫৬, ২৩০ ও ১০৪, ২০৫ ও ১০৮, ২১৫ ও ১৫০)। আশ্চর্যের ব্যাপার, এই আটটা ইনিংসেই তিনি ছিলেন অপরাজিত।

জহিরের ঝুলিতে আরও একটা রেকর্ড আছে, যা কোনও এশিয়ার ক্রিকেটারের নেই। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে একশোটি সেঞ্চুরি করেছেন তিনি। ব্রাডম্যান এবং নিউজিল্যান্ডের গ্লেন টার্নার ছাড়া আর যাঁরা একশোটি সেঞ্চুরি করেছেন তাঁরা সবাই ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার।

পাকিস্তানের পক্ষে পাঁচ হাজারের বেশি রান-সংগ্রহকারী এই ব্যাটসম্যান হঠাৎই টেস্ট-ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নিলেন। শুধু পাকিস্তান নয়, ক্রিকেট-বিশ্ব হারাল আজকের অন্যতম সেরা স্টাইলিশ ব্যাটসম্যানকে।

বুস্ট

সারাদিন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলার জন্য সুস্বাদু শক্তিদায়ী পানীয়

আপনার সন্তানটি আজকের এই ধাবমান অগ্রগতির যুগের এক বাড়ন্ত সন্তান।

আজকের এই জটিল ইলেকট্রনিক যুগের সব খেলাই তার জীবনে এক চ্যালেঞ্জ। তার আগ্রহী এবং কৌতুহলী মন এই জটিলতাকে জানবার জন্য সে অনেক বেশী পড়াশুনো করে, অনেক বেশী পরিশ্রম করে-আনন্দ পায়। স্কুলে, টেনিস কোর্টে অথবা যে কোন নতুন খেলাতেই সে পরিশ্রম করতে আগ্রহী কারণ সে সর্বত্রই সর্বাগ্রে থাকতে চায়।

সত্যিই, আপনার সন্তানের আজ এক ক্ষিপ্র, গতিশীল জীবন, এক তীব্রগামী ট্রেনের মতই দুর্বার গতিতে তার দিনগুলি এগিয়ে চলেছে।

বুস্ট — এক চকোলেটের স্বাদে সুস্বাদু শক্তিদাতা

এই স্ফূর্তি ভরা প্রাণচঞ্চল কর্মকাণ্ডে আপনার সন্তানের প্রচুর শক্তি ক্ষয় হচ্ছে। সুতরাং তার দিনগুলি এক নির্ভরযোগ্য শক্তিদায়ী পানীয় দিয়ে শুরু করাই সর্বোত্তম উপায়।

বুস্ট, ঘন দুধ, সোনালী দানার গম, মল্টেড বার্লি এবং কোকোর মতন শক্তিবর্দ্ধক উপাদানে তৈরী একটি সুস্বাদু পানীয়।

বুস্ট দুধে মিশিয়ে খেতে চমৎকার। সারাদিনের এই প্রাণচঞ্চল কর্মকাণ্ডের জন্য সজীব ও প্রাণবন্ত রাখতে সকালের জল খাবারের সঙ্গে বুস্ট একটি আদর্শ পানীয়।

বুস্ট

প্রাণচঞ্চল জীবনের জন্য অফুরান শক্তির রসদ

HMM-8734

Anandamela 22 January 1986. Regd. No. WB/CC/264. MH Bv-South 683TN/MS(c)/731